# মতুয়াধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস

# মতুয়াধর্ম
# এক ধর্ম বিপ্লব

## সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস

**প্রাপ্তিস্থান**
পি-৬১, উদয়ন আবাসন, উদয়রাজপুর,
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০ ১২৯
ফোন: ০৩৩-২৫১৮০৬৭২, ৯৭৩৩৮৮৮০৭১

**চতুর্থ দুনিয়া**
২২ ভবানী দত্ত লেন (কলেজ স্ট্রীট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দেশ বিদেশের সমস্ত মতুয়াদের উদ্দেশে

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জয় হরি-গুরুচাঁদ!

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস রচিত ছোট্ট বই 'মতুয়াধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব' বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়লাম। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থ দু'টি অনুসরণ করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। আমার মত সাধারণ মতুয়াভক্তরা শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদের জীবন ও লীলা যেভাবে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি, দু'একটি ক্ষেত্রে লেখক অন্যভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। নতুন মনে হলেও সে ব্যাখ্যা ভালই মনে হলো। বিষয়গুলি মতুয়াদের নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

বইটা ছোট। অল্প জায়গার মধ্যে মতুয়াধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখা আছে। মতুয়া ভক্তদের পড়া এবং বোঝার জন্য তাই খুবই সুবিধা হবে। সাধারণ মতুয়াভক্তদের জন্য এমন বই খুব প্রয়োজন।

বইটিতে লেখক ধর্ম বিষয়, শিক্ষা বিষয়, সামাজিক বিষয়, আর্থিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতের শিক্ষা যেভাবে পৃথক পৃথক করে সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তা নতুনত্ব দাবি করতে পারে। গার্হস্থ্য ধর্ম যে অন্যধর্মের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এই বই পড়লে মতুয়া ভক্তরা তা সহজে বুঝে নিতে পারবেন।

শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ যে সত্যিই অন্যান্য অবতার বা মহামণীষীদের থেকে আলাদা ও মহান এবং মতুয়াধর্ম যে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ও মতাদর্শ; তা সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে এই পুস্তিকায় লেখা হয়েছে।

এই বই সমস্ত মতুয়াভক্তদের অবশ্য পাঠ্য এবং সংগ্রহে রাখার মত বই বলে আমার মনে হয়।

২২/০৩/০৮ পাগল সনাতন

# দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

আজ কলকাতার মহাজাতি সদনে পালিত হচ্ছে মহামানব হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের দু'শ বছর পূর্তি উৎসব। পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে মতুয়াদের বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে। মতুয়াদের ডংকা অভিযানে কলকাতার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজক 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশন।'

হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়াধর্মের বিজয় নিশান আজ বহু দেশের সীমান্ত পেরিয়ে দখল করে চলেছে নতুন নতুন সাম্রাজ্য। রাষ্ট্রীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কমবেশি দেড়শ' বছরের সীমিত সময়ে মতুয়াধর্মের এই ব্যাপক বিস্তার সম্ভবতঃ ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

মতুয়াধর্মের সাফল্য শুধুমাত্র তার ব্যাপক বিস্তারের নিরিখে নয়। এই গার্হস্থ্য ধর্ম তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভেদের ক্ষেত্রেও বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। বাংলার কয়েক কোটি পতিত-অস্পৃশ্যকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শন ও আন্দোলন। অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কারের পাহাড় টপ্‌কে ঘৃণিত অস্পৃশ্যদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শিক্ষার আঙিনায়। চাগিয়ে তুলে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে। আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের থেকেও অত্যাশ্চর্য তার ক্ষমতা ও মহিমা!

সাধারণত সব ক্ষেত্রে, সবসময়েই সাফল্যের হাত ধরে হাজির হয় নানা সমস্যা ও সংকট। মতুয়া ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা ও সংকটের আভাস উঁকি মারতে শুরু করেছে—যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানায়।

হরিচাঁদ ঠাকুর শৈশব শুরু করেছিলেন কর্মহীন অনুৎপাদক বৈষ্ণব বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। পরিণত বয়সে তিনি বিরোধিতা করেন হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থাদির ও বর্জন করেন হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কার। গুরুবাদ, জন্মান্তরবাদ, পরকাল ও ব্রাহ্মণ—এসব কিছুকেই তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে নস্যাৎ করে দেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন মানব জীবনের প্রয়োজনীয় ধর্ম, বাস্তবের ধর্ম — যাকে গার্হস্থ্যধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। মতুয়াধর্ম এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, বিপ্লবী মতবাদ। এ হলো ধর্ম বিপ্লব, সমাজ বিপ্লবের অত্যাধুনিক হাতিয়ার। পতিত মুক্তির মহামন্ত্র। মতুয়াধর্ম পতিত মুক্তি আন্দোলনের শানিত অস্ত্র—যা লড়াইয়ের ময়দানে মিত্র শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায় এবং শত্রুকে চিনিয়ে দেয়। শত্রুর দুর্বলতাকে উন্মোচন করে; আর পতিতদের নিজস্ব শক্তির ভাণ্ডার আবিষ্কারের পথ চিনিয়ে দেয়। ব্যক্তিমুক্তি নয়, সমষ্টি মুক্তি বা সমাজ মুক্তির দর্শন হলো মতুয়া ধর্ম—যা বহুজনের শক্তি সংহত করার তাত্ত্বিক ভিত্তি।

হরিচাঁদ ঠাকুরের সার্থক উত্তরাধিকার কর্মবীর গুরুচাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদের নেতৃত্বে

পতিত মুক্তি আন্দোলনে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার রেশ আজও মিলিয়ে যায়নি ঠিকই; কিন্তু সেই আন্দোলনকে আরও বিকশিত করা; নিতান্ত তাকে বয়ে নিয়ে যাবার মত যোগ্য নেতৃত্ব গুরুচাঁদের পর আর আসেননি। আন্দোলনে গতিহীনতা—স্রোতহীন আবদ্ধ আধমরা নদীতে বাসা বেঁধেছে শ্যাঁওলা, কচুরিপানা, জঙ্গল! এ এক অশনি সংকেত!

হরিচাঁদ ঠাকুর লড়াই শুরু করেছিলেন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে—ধর্মীয় গোঁড়ামী, অনাচার, অবিচার ও ঘৃণার আঁতুড় গৃহ হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র-গ্রন্থাদির বিরুদ্ধে। এইসব শাস্ত্র-গ্রন্থাদিকে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের স্তুতিপত্র ও বিজ্ঞাপন যন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে তা অস্বীকার করার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ দেখা যাচ্ছে — মতুয়াদের একাংশ হরিচাঁদ ঠাকুরের মৌলিক শিক্ষাকে আত্মস্থ না করতে পেরে, যার বিরুদ্ধে ঠাকুর নিজেই লড়াই করেছিলেন, দুই বাংলার ঠাকুরবাড়ি এবং ঠাকুর ভক্তবৃন্দ সেই হিন্দুধর্মের পঙ্কিল পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছেন। হিন্দুধর্মীয় তত্ত্ব—আত্মা-আধ্যাত্মবাদ এবং নানা কুসংস্কার ও রীতিনীতির সাথে মতুয়া ধর্মের কিছু নতুন কুপ্রথার যোগফল —চলমান ধর্মীয় কুসংস্কারের বোঝাকে বরং আরও কিছুটা বেশি ভারি করে তুলেছে! —এ যেন বোঝার উপর শাঁকের আটি!

মতুয়া ধর্মের মধ্যে গুরুবাদ নতুন আঙ্গিকে ফিরে এসেছে। এইসব গুরুরা মতুয়াদের চিত্তশাসন করে বশ্যতা অর্জনের নানা নতুন নতুন কৌশল রপ্ত করে ফেলেছেন। যার ফলে, মতুয়া গুরুরা ভক্তদের উপর যে আর্থিক শোষণ চাপিয়ে দিচ্ছেন, তাকে ভক্ত-শিষ্যরা মহার্ঘ্য ভাবছেন ও নিজেদের ধন্য বলেই মনে করছেন। মতুয়া গুরুরা অধিকাংশই গরিব মানুষ এবং প্রায় নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত। একথা ঠিক—তারা পরিবার নির্বাহের জন্য এ গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করেন; কিন্তু এই প্রথা যে, শেষ বিচারে মতুয়াধর্মের অন্তর্বস্তুকে শেষ করে ফেলবে, এ সত্য আমাদের বুঝতে হবে। এ গুরুতর সমস্যার আলোচনাকালে একথাটিও ভুললে চলবে না যে, এই সমস্ত মতুয়া গুরুরাই মতুয়া ধর্মের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মতুয়াধর্মের কলেবর বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহযোগিতা করছেন।

মতুয়াধর্ম দর্শনের সাথে হিন্দুধর্ম দর্শনের কোন মিল নেই; বরং তা সরাসরি বিরোধি অবস্থানে প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতের মত হল—“ধর্ম কথা তুচ্ছ অতি, ধর্ম দুর্বলের নীতি।” কিন্তু বাস্তবতঃ মতুয়াধর্ম যেন হিন্দুধর্মের একটা উপশাখা হিসাবে হিন্দুধর্মের মধ্যেই অবস্থান করছে। মতুয়া মতাদর্শ ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর এ অবস্থা মোটেই চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তার মতবাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা—যে মতবাদ মুক্ত বিহঙ্গের মত অসীম নীল আকাশে ডানা মেলে উড়বে! অবুঝ হরিভক্তরা হরিচাঁদের নামে ধ্বনি দিয়ে যে, হরিচাঁদেরই স্বপ্নের সমাধি রচনা করে চলেছেন—এ সত্য তারা বোঝেন না!

হরিভক্তদের এই গণ আত্মহত্যার জন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। গুরুচাঁদ পরবর্তী বংশধরগণ, মতুয়া বোদ্ধা ও পদাধিকারি কিছু মানুষ এই জটিলতা সৃষ্টির জন্য দায়ি বলে

মনে করার যথেষ্ট তথ্য আছে। —যা এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধের মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো।

মতুয়াদের এবং মতুয়া মহাসংঘকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। অমতুয়া এবং ঠাকুর পরিবারের ব্রাত্য, বাতিল ও অযোগ্য এক উত্তর পুরুষকে শিখণ্ডী খাড়া করে এই রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে। ষড়যন্ত্রকারিদের একাংশ এই দুষ্টগ্রহকে এমনকি 'প্রাণের ঠাকুর' বলে উল্লেখ করে প্রচার শুরু করেছেন। মতুয়াদের বিভক্ত করা এবং তাদের আন্দোলন বানচাল করার জন্য এই অপচেষ্টা অন্তর্বস্তুতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পতিত মুক্তির লক্ষ্য থেকে মতুয়া আন্দোলনের অভিমুখ অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া। শুধু মতুয়াদের নয়—পতিত মুক্তি আন্দোলনের অন্য এক শানিত অস্ত্র ড. আম্বেদকর ও তার মতবাদ। পশ্চিমবঙ্গের আম্বেদকরবাদীদের বিভ্রান্ত ও বোতলবন্দি করার জন্য উদীয়মান ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি অপর এক বিপথগামী ক্ষমতালোভী বৃদ্ধকে ব্যবহার করার চাল চেলেছে।

এসব আধুনিকতম ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিরোধ করে মতুয়া আন্দোলনকে বা গোটা পতিত মুক্তি আন্দোলনকে লক্ষ্য পথে অটল ও অবিচল রাখতে এই আন্দোলনে শিক্ষিত ও নতুন রক্তের জোগান বাড়াতে হবে। তারজন্য মতুয়াদের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। আধুনিক যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মানানসই করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে সংগঠনে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে সংগঠনের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে—শিক্ষিত ও যোগ্য নেতৃত্বের হাতে। এ ব্যাপারে ঠাকুরবাড়িকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মতুয়া ধর্ম ও ধর্ম দর্শন নিয়ে অনেক লেখা ও কিছু গবেষণার কাজও হয়েছে। কিছু গবেষকেরা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন—কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। গবেষকরা মতুয়াধর্ম দর্শনের অন্তর্বস্তুর ত্রিসীমানাতে পা ফেলতে পারেননি বলে কেউ কেউ যে মত ব্যক্ত করেন, তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজারহাট নিউ টাউনে প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ ফাউণ্ডেশন এই গুরুদায়িত্ব পালন করুক।

আমার চিন্তা ও পরিকল্পনায় যুক্তি, তথ্য ও ভাব যেটুকু যা থাকুক না কেন, কিন্তু লেখনীতে যে কোন সুক্ষ্ম শিল্পগুণ নেই, তা আমি জানি। কলমটা আমার হাতে হাতুড়ির মত এবং আমি জানি তার আঘাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেরই মাথা ফাটে। তবুও হাতুড়িটা আমি বেপরোয়াভাবেই চালাতে চাই।

'দর্শন' শব্দের অর্থ ঠিকভাবে না বুঝেও তা নিয়ে কিছু কথা আমি বলেছি। আর গুরুচাঁদকে পড়ে বুঝেছি যে, মতুয়া মানে আন্দোলন। — শিক্ষা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন — এসব আন্দোলনের সম্মিলিত সমাহার হলো রাজনৈতিক লড়াই, মুক্তি সংগ্রাম।

মতুয়াদের সাথে নিয়ে সে চেষ্টাও করেছি এবং করে যাচ্ছি। মতুয়া ও গোটা

বাঙালি উদ্বাস্তু সমাজের স্বার্থে আন্দোলন। তাতে মতুয়ারা খুশী, আশান্বিত, উৎসাহিত। কিন্তু গুরুবাদ আতংকিত। মতুয়া মহাসংঘের গুরুকুল ও শীর্ষগুরু সিদুঁরে মেঘ দেখছেন এবং নানাভাবে এই আন্দোলনের লাগাম টেনে ধরার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা মতুয়া সমাজ ও মতুয়াভক্তদের হরি-গুরুচাঁদ নির্দেশিত লড়াইয়ের রাজপথ থেকে টেনে হরিমন্দিরে আবদ্ধ করে রেখে ব্যক্তিস্বার্থ ও সুবিধা আদায়ের পথ গ্রহণের চেষ্টা করছেন। মতুয়াদের স্বার্থে, দেশের প্রয়োজনে এই সুবিধাবাদকে পরাস্ত করতে হবে।

এ পুস্তিকা হলো একটি চিঠি এবং দু'টি প্রবন্ধ-প্রতিবেদনের যোগফল। প্রথম সংস্করণে চিঠিখানি এবং 'অনন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের স্বতন্ত্র-স্বাধীন মতুয়াধর্ম' প্রবন্ধটি ছিল না। এই সংস্করণে তা যুক্ত করা হলো। আলাদা সময়ে, ভিন্ন প্রয়োজনে প্রবন্ধ-প্রতিবেদন ও চিঠিখানি লেখা। তাই, কিছু কথার পুনরাবৃত্তি পাঠকদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু এ দোষ এড়ানোর উপায় নেই। পুস্তিকাটির এই দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ মতুয়াদের সৃষ্টির মহাযজ্ঞে যদি সামান্যতম কাজ দেয়, তাহলে প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক বলে মনে করবো।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১২

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস
লেখক

# প্রিয় মতুয়া ভাই-বোন ও পাঠকদের উদ্দেশে কয়েকটা কথা

ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দুধর্ম বিরোধি। আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, হিন্দুধর্ম তাকে কোন মর্যাদা দেয়নি; বরং দিয়েছে অসম্মান ও ঘৃণা। একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কেউ এ অবস্থা এবং ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না — অন্ততঃ আমি মেনে নিতে পারিনি।

একটা সার্বিক ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে; অর্থাৎ ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের পেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করলেও হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ নীতি-নিয়ম সমর্থন করা যায় না। হিন্দু ধর্মীয় নির্দেশগুলি এবং তার অনুশীলন পক্ষপাতদুষ্ট। এসব অনাচার চলে ধর্মের নামে; তাই 'ধর্ম' শব্দটির প্রতি বিরূপতা ও ঘৃণার মনোভাব তৈরি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। মনে হয় আমার অনুভূতি আরও অনেকের অনুভূতির সাথে মিলে যাবে।

কিছু মানুষ আছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন যারা মুখ বুজে সহ্য করেন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেষ্টা এককভাবে হতে পারে, সমষ্টিগতভাবেও হতে পারে। হরি-গুরুচাঁদের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শেষ কথা নয়; এ হলো শুরু। প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির শর্ত হলো—অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, ঘৃণার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃত্ব, অন্ধত্বের বিরুদ্ধে শিক্ষার প্রচলন করা। হরিগুরুচাঁদ সেই বিকল্প পথের সন্ধান দেন, আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেন, প্রতিষ্ঠা করেন মতুয়াধর্ম।

শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত—মতুয়াধর্মের এই মূল গ্রন্থ দু'টি কবিতার ছন্দে লেখা। কবিতায় সব কথা বিস্তারিত বলা যায় না, ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। বহু কথাই অনুক্ত থাকে, আভাস-ইঙ্গিতে বলা হয়। সেজন্য ঠাকুরের আজ্ঞা-নির্দেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হবার সম্ভাবনা থাকে। তাতে মতুয়াদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির বিপদও হতে পারে। তাই, প্রয়োজন ছিল ধর্মগ্রন্থ দু'টির ব্যাখ্যামূলক সহায়ক গ্রন্থ রচনা করার। অনেক আগেই তা লেখা উচিত ছিল। কারণ একবার মানুষ একভাবে বুঝে নিলে, সে ধারণার পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সে কাজ যে একেবারেই হয়নি, তা নয়। কয়েকজন মানুষ মতুয়াধর্ম নিয়ে গবেষণাও করেছেন। কেতাবী গবেষণা। সে গবেষণার মূল লক্ষ্য মতুয়াধর্মের যুগান্তকারি শিক্ষার আলো আরও প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে পরিবেশন করা নয়। মতুয়াধর্মের মৌলিক বস্তুবাদী শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধতর করা নয়। বরং গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ তা করেছেন নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার তাগিদ থেকে ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার মানসিকতা নিয়ে। তাতে ছিল নেহাত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জগতে ডিগ্রি বা

ডক্টরেট জোগাড় করার তাড়না! ফলে, কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি; বরং বহুক্ষেত্রে জটিলতা বেড়েছে।

অনেক মতুয়া মনে করেন কিছু মানুষ মতুয়াধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন, খুব বোঝেন—এই সব মতুয়াধর্ম বিশেষজ্ঞ মানুষদের সাথে অনেক মতুয়াসভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাতে আমার মনে হয়েছে—এইসব বিশেষজ্ঞরা মতুয়াধর্মের সার কথা প্রচার করার থেকে, আসর বুঝে বক্তব্য রাখতে ভালবাসেন—যাতে হাততালিটা বেশি পাওয়া যায় ও বায়না বেশি জোটে। সত্যের জন্য স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার যে ব্রত হরি-গুরুচাঁদ নিয়েছিলেন—এইসব বড় বড় মতুয়া বোদ্ধাদের তা নেই।

গার্হস্থ্য ধর্ম ও সন্ন্যাস-বানপ্রস্থের ধারণা যেমন পরস্পর বিরোধি, তেমনি বস্তুবাদী ভাবনা এবং আধ্যাত্মবাদ—এই দু'টি বিষয়ও পৃথক ও একের থেকে অন্য সম্পূর্ণ বিপরিত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে সর্বনাশা আধ্যাত্মবাদী হিন্দুধর্মের প্রভাব বলয় থেকে পতিতদের মুক্ত করে জীবনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বস্তুবাদী গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন হরি-গুরুচাঁদ। কিন্তু অনেকেই বলার চেষ্টা করেন যে, আধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণে মতুয়া ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয় এ ধারণা ভুল। কারণ হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, বাস্তব-অবাস্তব — এমন সব পরস্পর বিরোধি ধারণা ও বিষয় নিয়ে তালগোল পাকিয়ে 'খিচুড়ী মত' পরিবেশন করবেন — এসব ভাবা, এই দুই মহামনীষীর প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তারা তা করতে পারেন না, করেননি। সত্য চেতনায় কোন মাঝামাঝি বা আধা আধি ব্যাপার থাকে না। কোন সমঝোতার মধ্যপন্থা থাকে না। সত্য সব সময় আপোসহীন — সে জন্যই মতুয়াধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব।

'আমি সব বুঝি'—এ দাবি আমি করছি না। আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ করে হরি-গুরুচাঁদের শিক্ষা আত্মস্থ করার মত কোন জ্ঞান আমার নেই। সমাজের বিজ্ঞজনদের কেউ কেউ তা হয়তো পারতেন। তারা কলম ধরলে সমাজ বেশি উপকৃত হবে। —তবুও আমি কিছু একটা লিখলাম। মতুয়াধর্ম গ্রন্থ দু'টি মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়েছি। তাতে যতটুকু বুঝেছি, অকপটে তা এই ছোট পুস্তিকায় প্রকাশ করেছি। কোন রাখঢাক করিনি। লীলামৃত ৩২৫ পাতার এবং গুরুচাঁদ চরিত ৬০২ পাতার বই। মোট ৯২৭টি চওড়া পাতার বিশাল ভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তো কুড়িয়ে আমি মাত্র ৮০ পাতায় বন্দি করেছি। কাজটা খুব সহজ ছিল না। তবুও চেষ্টা করেছি। তা যদি মতুয়া সমাজ ও গোটা মানব সমাজের উন্নয়নে সামান্যতম কোন কাজে আসে, তাহলে আমার চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

পরিশেষে সোনাদাকে ধন্যবাদ জানাই বইটি সম্পর্কে ছোট কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা লিখে দেবার জন্য।

জয় হরি-গুরুচাঁদ!

২৫শে মার্চ, ২০০৮

**সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস**
লেখক

# অনন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের স্বতন্ত্র-স্বাধীন মতুয়াধর্ম

[প্রবন্ধটি ২৫.০১.২০১১ তারিখে লেখা এবং সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে সন্তোষকুমার বাড়ুই সম্পাদিত 'ঠাকুর শ্রীশ্রীহরিচাঁদ মানব পুরুষঃ আধ্যাত্ম পুরুষ' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়]

সাধারণতঃ নতুন কিছু সৃষ্টি বা সৃষ্টি শুরুর কাজ আরম্ভ হয় প্রয়োজনের তাগিদ থেকে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই নব নব উদ্ভাবন ও সৃষ্টির পিছনে এই তাগিদ লক্ষ্য করা যায়, এমনকি মানুষ ও জীবজগতের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতেও অহর্নিশ চলছে নতুন সৃষ্টির মিছিল।

সেদিন খুব বেশি প্রাচীন নয়, যখন পৃথিবীতে আজকের মত এতসব ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন যীশুখৃষ্টের জন্মের মোটামুটি ৬০০ বছর আগে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৫৬৩ সাল বা মতান্তরে ৬২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ৯ই মে। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাই, বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি আজ থেকে ২৬০০ বছরের আগে নয়। খৃষ্টের জন্ম থেকেই ইংরেজী সাল গণনা। খৃষ্টধর্মের বয়স সামান্য কম ২০০০ বছর। হযরত মোহম্মদের জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। তাই, ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিকাল ১৪০০ বছর। শিখধর্ম আরও পরে। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল। গুরুনানক জন্মগ্রহণ করেন ১৫ এপ্রিল ১৪৬৯ সালে। গৌরাঙ্গের লীলাকাল ১৪৮৬ সালের পরবর্তী ৪৮ বছর এবং মহামানব হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ সালের ১১ই মার্চ (১২১৮ বঙ্গাব্দ)। মতুয়াদের লড়াই শুরু এই সময়কাল থেকে।

আজকের দিনে হিন্দুধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি— অতীতে তাকে যে নামেই অভিহিত বা পরিচিত করা হোক না কেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ধর্ম অন্য ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন। হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রাচীনকালে গোটা পৃথিবী ব্যাপ্ত ছিল কি-না জানি না—তবে আজ থেকে ২৬০০ বছর আগে, যখন বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয়, তখনও হিন্দুধর্মের ভরকেন্দ্র যে ভারত-আরব ভূখণ্ড ছিল, তাতে কোন সংশয় নেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের সৃষ্টির তাগিদ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রচার-প্রসার যে স্বল্প সংখ্যক কিছু মানুষের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করা—একথা আজ সামাজিকভাবে স্বীকৃত। মুষ্টিমেয়র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধর্মের মোড়কে মানুষ ও মানব সমাজকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট—শুধু এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়নি; পর্যায়ক্রমিক মর্যাদা ও অমর্যাদার ভিত্তিতে বহুধা বিভক্ত করা হয়। এমনকি বিশাল সংখ্যক এক জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ ও দর্শনের অযোগ্য ঘোষণা করে তাদের মনুষ্যতর

ইতর পশুতে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয় ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। তাদের বেঁচে থাকার প্রায় সব পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার জন্য মতুয়া ধর্মগ্রন্থ এইসব হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের বিরোধিতা করে চলেছে। হরিচাঁদের মতে— "ব্রাহ্মণ রচিত যত অভিনব গ্রন্থ, ব্রাহ্মণ প্রধান মার্কা বিজ্ঞাপন যন্ত্র।" —তাই, হিন্দুশাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে, অস্বীকার করে, দু'পায়ে মাড়িয়ে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মন্ত্র শেখায় মতুয়াধর্ম।

স্বল্পসংখ্যক মানুষের একাধিপত্য, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিয়ন্ত্রণ, অবিচার ও ঘৃণা যে বিপুল সংখ্যাধিক মানুষ বহুকাল মুখ বন্ধ করে সহ্য করেন না, প্রতিবাদ করেন, মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন, এটা শাশ্বত সত্য। ধর্মের নামে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই সংগঠিত-অসংগঠিত বহু বিদ্রোহ ও লড়াই হয়েছে। ব্যর্থ লড়াইয়ের ইতিহাসের খবর সাধারণত জানা যায় না। আমরাও তার সবকিছু জানি না।

বহু ব্যর্থ লড়াইয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য ও সফল এক লড়াইয়ের নায়ক গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম। গৌতমবুদ্ধের লড়াই ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করে মানুষকে সজাগ ও সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীব্যাপী ডানা মেলতে থাকে। দলে দলে মানুষ এই সাম্য ও মানবতাবাদী ধর্মকে গ্রহণ করতে থাকেন। এরপর একে একে আবির্ভূত হন যীশুখৃষ্ট, হযরত মোহম্মদ, গুরুনানক, শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিচাঁদ ঠাকুর। বিশ্বের মানব সমাজ হাঁটি হাঁটি পায়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলে।

বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই—এইসব মহামনীষীরা শুরু করেছিলেন এক একটি আপোষহীন লড়াই। সেইসব লড়াইয়ের ইতিহাস, পথ প্রকরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংহত ও সন্নিবেশিত করে এবং বহুক্ষেত্রে সমর্পণ ও সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক একটি মতাদর্শ ও জীবন দর্শন, আচার-আচরণ — যা আজ ধর্ম নামে পরিচিত। ধর্মই ছিল প্রতিবাদ ও নবনির্মাণের পথ-প্রকরণ।

এইসব ধর্মমতগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। — প্রথমতঃ আলোচিত সব ধর্মমতগুলিতে বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ধর্মের অভ্যন্তরে সামাজিক সাম্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও কার্যতঃ এবং বাস্তবতঃ বহুলাংশে এইসব ধর্মের মধ্যে বর্ণবৈষম্যের বিষ চুঁইয়ে প্রবেশ করেছে। ধর্ম পরিবর্তন করলেও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব সবাই, সবক্ষেত্রে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হননি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও কিছুমাত্রায় পেয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ এইসব প্রতিটি ধর্মের জন্ম হয়েছে পৃথিবীর একই প্রান্তে—ভারত-আরব ভূখণ্ডে, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের কেন্দ্রভূমিতে। তাই, যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফসল, অমানবিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুধর্মকে উৎখাত করার শপথ—একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের বিপরীতে বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং শিখধর্ম মতাদর্শ ও জীবনাদর্শের আচার-আচরণের বহুক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সাথে বৈসাদৃশ্য এবং কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য সত্বেও নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে, আলাদা পরিচয় ঘোষণা করে, ধর্মমতগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব ধর্ম তা পারেনি। বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে

একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং তাতেই তারা মহানন্দ অনুভব করেন!

মতুয়াধর্মের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের সাথে মতুয়াধর্মের মতাদর্শগত কোন সাদৃশ্য নেই। সেখানে পুরোপুরি বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ধর্মীয় মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তার প্রতিফলন মতুয়া সমাজের মানুষের জীবনাদর্শে, আচার-আচরণে দেখা যায় খুব সামান্য বা প্রায় দেখা যায় না। মতুয়া সমাজের খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ মতুয়াধর্ম নির্দেশিত আচার-আচরণ ঠিকমত পালন করেন। তারা আজও প্রায় হিন্দুদের মতই আচার-আচরণ পালন করে চলেছেন।

মতুয়াধর্মের মতাদর্শের সাথে মতুয়াদের জীবনাদর্শ বা আচার আচরণের যে বৈপরিত্য এবং আচার-আচরণে হিন্দুধর্মের সাথে যে নৈকট্য, তা আজ মতুয়াধর্মকে এক বড় প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাহলো—মতুয়াধর্ম কি কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন ধর্ম, না হিন্দুধর্মেরই কোন এক স্রোতধারা বা সম্প্রদায়? মতুয়াধর্ম কি তার স্বতন্ত্র স্বাধীন পরিচয় নিয়ে বিকশিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে, না তার পরিণতি হবে বৈষ্ণব ধর্মেরই অনুরূপ?

কোন শিশু একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বিকশিত হবার সব কিছুই একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে থাকে। সময়ের সাথে সাথে শিশুরা সব ক্ষেত্রে বেড়ে উঠে পরিপূর্ণ একজন মানুষে পরিণত হন। মতুয়াধর্ম ঠিক তেমন একটি বিপুল সম্ভাবনার নতুন ধর্ম –– যে ধর্মমত এখনও ২০০ বছরের গণ্ডি পার হয়ে আসেনি। উপযুক্ত পরিচর্যা পেয়ে যার মহিরূহে পরিণত হবার সমস্ত সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে আছে। শুধু প্রয়োজন অত্যাধুনিক এই ধর্মকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা। মতুয়াধর্মের মতাদর্শের স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা ও নীতি-নির্দেশ এবং তার বিপ্লবী চরিত্রকে নিপুণভাবে সূত্রায়িত করা এবং তারপর তাকে এক ভাষা ও ভাবধারায় ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা।

এক একটি পূর্ণ ধর্মমতের কয়েকটি করে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। — যা মতুয়াধর্মের অধরা নয়। প্রতিটি ধর্মের থাকে এক বা একাধিক পবিত্র গ্রন্থ—যা ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। বাইবেল, কোরাণ, গীতা-বেদ-পুরাণ-উপনিষদ, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহিব, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি। মতুয়াধর্মের আছে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। এছাড়া ধর্মীয় গ্রন্থ শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ চরিত্র সুধা, মহাসংকীর্তন, মতুয়া সংগীত, শ্রীশ্রী হরিসংগীত প্রভৃতি। প্রতিটি ধর্মের মানুষের থাকে একটি করে পবিত্র দিন, যে দিনটিতে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা বিশেষ প্রার্থনা করেন। রবিবার, শুক্রবার, প্রভৃতি। মতুয়াদের সে দিনটির নাম বুধবার। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মবার—যাকে সমস্ত মতুয়া সমাজ পবিত্র বার হিসাবে মানেন এবং প্রার্থনা করেন। মঠ, মন্দির, গীর্জা, গুরুদোয়ারা, মসজিদের ন্যায় মতুয়াদের আছে অসংখ্য পবিত্র হরিমন্দির। ভগবান বুদ্ধ, ঈশ্বর, আল্লা ও ভগবানের ন্যায় মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা ও দেবী শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-শান্তিমাতা। পাদ্রী, যাজক, ভিক্ষু, ইমাম, মৌলবী, পুরোহিত সদৃশ মতুয়া সমাজের আছে অগণিত সাধু, পাগল, গোঁসাই — যারা মতুয়াধর্মের প্রচারক। মাথায় টুপি, পাগড়ি, গলায় ক্রস, কপালে চন্দন, মাথায়

টিকি, মাথা মুন্ডন, গায়ে গেরুয়া বসন। গলায় আচার মালা চিনিয়ে দেয় মতুয়া ভক্তদের। মক্কা-মদিনা, বুদ্ধগয়া, শংকরাচার্যের মঠ-আশ্রম, স্বর্ণমন্দির, নবদ্বীপ-মায়াপুরী, পোপের আবাস ভাটিকান সিটির ন্যায় মতুয়াদের তীর্থ—শ্রীধাম ওড়াকান্দি ও শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি — যেখানে লক্ষ লক্ষ মতুয়া জমায়েত হয়ে নিজেদের ধন্য ও পবিত্র মনে করেন। মতুয়াদের উপাসনার পদ্ধতি হলো জয়ঢাক, লাল নিশান, শিঙা-কাশির সহযোগে বুক চিতিয়ে যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে কীর্তন, হরিনাম —যা শুধু মতুয়াদের করায়ত্ত। স্বতন্ত্র-স্বাধীন ধর্মমতের সব বাহ্যিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য মতুয়াধর্মে বিরাজমান, কোন ঘাটতি নেই!

মতুয়াধর্মকে বলা হয় 'সহজ সরল গার্হস্থ্য ধর্ম'। অর্থাৎ গার্হস্থ্য বা সংসারির ধর্ম। সংসার মানে পার্থিব জগতের কর্মক্ষেত্র, ইহকালের লড়াই-সংগ্রাম, না পাওয়া-পাওয়ার, আনন্দ-বেদনার কথকতা। সুন্দর সংসার গড়ার মন্ত্রণালয় হলো মতুয়াধর্ম। সংসার জীবনকে অনিত্য বলে গৃহধর্মের গুরুত্ব লঘু করায় মতুয়াধর্ম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সমালোচনা করে। ধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট মানব সমাজের উদ্ধারের সংগ্রামে নেমে সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও গৌতম বুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেনি মতুয়াধর্ম। লীলামৃত গ্রন্থে তাই লেখা হয়েছে— "তাই দেখি গৃহধর্ম সকলের মূল। এইখানে বুদ্ধদেব করিলেন ভুল।। এই ভুল এতকাল সারা নাহি হল। ভুল সেরে মুক্তি দিতে হরিচাঁদ এলো।।" অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ এবং শ্রী গৌরাঙ্গের দর্শন ও আন্দোলনের অসম্পূর্ণতা এবং ভুলভ্রান্তি দূর করে মানব মুক্তির দিশারি হিসাবে কর্মমঞ্চে উপস্থিত হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরকে সেজন্যই অনন্য এবং পূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়।

যে কোন লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করতে হলে সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে বোঝা দরকার। সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে না পারলে শত্রু-মিত্র পৃথক করা যায় না। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত করা যায় না। হরিচাঁদ ঠাকুর ঘোষণা করলেন যে, তিনি 'পতিত পাবন। পতিত সমাজকে উদ্ধার বা মুক্ত করতে তিনি এসেছেন।' মানুষের পতিত হবার কারণ হিসাবে মূলতঃ তিনি হিন্দুধর্মীয় নীতি নির্দেশকে দায়ি করলেন। এবং ঐ ধর্মের প্রভাব বলয় থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

হিন্দুদের দেবী-দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটি। হরিচাঁদ ঠাকুর যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতে আনুমানিক (ধরে নেওয়া যাক) ১১ কোটি মানুষ পতিত-অস্পৃশ্য — তিনজন দেবী-দেবতা মিলে যদি একজন করে পতিতকে তারা উদ্ধার করতেন বা উদ্ধার করতে পারতেন, তাহলে ভূভারতে কোন পতিত থাকতেন না। কিন্তু তা হয়নি। অনন্তকাল ধরে পতিত মানুষেরা অভুক্ত, বিদ্যাশূন্য ও অমর্যাদার গ্লানি নিয়ে কোনমতে টিকে ছিলেন। তাই, আবির্ভূত হতে হলো হরিচাঁদ ঠাকুরকে। তিনি জানতেন —ধর্মীয় নীতি-নির্দেশ স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা নয়। ধর্মের নিজস্ব ইচ্ছায় বা ক্ষমতায় তা কার্যকরি হয় না। তাকে কার্যকরি করতে হয়। তার ধারক এবং বাহক প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের ধারক-বাহক হিসাবে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজকে সনাক্ত করে ডাক দিলেন, "বেদ বিধি নাহি মানি, না মানি ব্রাহ্মণ।"

কিন্তু পতিত উদ্ধারের ঘোষণা তো নতুন নয়। বরং বহু পুরনো। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের ২৪০০ বছর আগে গৌতমবুদ্ধ প্রায় ঐ একই কথা বলেছিলেন এবং কাজ

করেছিলেন। গৌতমবুদ্ধের সাথে তুলনীয় না হলেও, আরও অনেক মহাপুরুষের ন্যায় শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও এসেছিলেন। তাদের চেষ্টায় সে কাজ যে একেবারেই এগোয়নি, তা নয়। কিন্তু উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ও এগোনো-পিছানোর অমোঘ নিয়মের রেখা ধরে গোটা ভারতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ যখন মনুষ্যতর জীবন যাপনে বাধ্য— সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে প্রভাত কিরণ রূপে আবির্ভূত হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

হরিচাঁদের অন্য এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো — তিনি জন্মগ্রহণ করেন 'চণ্ডাল' পরিবারে। অস্পৃশ্য চণ্ডাল। বাংলার সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত জনগোষ্ঠী। যে নাম আজ নমঃশূদ্র নামে রূপান্তরিত। লীলামৃতের ভাষায় বলা হয়েছে—"নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার। অতি নিম্নে না নামিলে কিসের অবতার?" — এ হলো এক যুগান্তকারি শিক্ষা — যাঁদের লড়াই তাদেরই লড়ার ডাক, নিজেদের নেতৃত্বে লড়াই করে জয়ী হবার মন্ত্র। সমাজের সবচেয়ে পিছনের সারিতে বেঁধে রাখা, সর্বাধিক ঘৃণিত-নিন্দিত বলে প্রচারিত বিশাল ও মহান এক জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে ও চাগিয়ে তোলার শপথ। লড়াই শুরু হলো। সময়ের বিচারে যে কাজ ও চিন্তা ছিল প্রায় অসম্ভব। হাজার হাজার বছরের গ্লানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাংলার গোটা অন্ত্যজ সমাজ — চণ্ডাল, পোদ, জেলে-মালো-রা যে আজ ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছেন, এ প্রগতির রথ ও পথের রূপকার একমাত্র হরিচাঁদ। কোটি কোটি দেবতার বামে এক রক্তিম প্রভাত সূর্য!

সমাজে ও গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরকে অবতার, পূর্ণব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। অথচ লীলামৃত গ্রন্থ একথাও বলছে যে, হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন জীবজগতের অন্যদের মতই রক্ত-মাংসে গড়া, জন্ম ও মৃত্যু ঘেরা মানুষ, মহামানব। — "ঐ যে সে মানুষ, মানুষে মিশে গেল" (লীলামৃত)। তাহলে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ঈশ্বর, অবতার বা ভগবান বলা কি ঠিক নয়? —অথবা তাকে মানুষ বলে অভিহিত করা কি হরিচাঁদ ঠাকুরকে ছোট করা নয়? — আপাত দৃষ্টিতে এসব বাক্যগুলিতে এক ধরনের স্ববিরোধিতার সুর ধরা পড়ে ঠিকই। কিন্তু মতুয়াধর্মে ঈশ্বরের ধারণাকে বিচার করতে হবে পতিতমুক্তি আন্দোলনের নেতা হিসাবে। হরিচাঁদ ঠাকুর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতার বিচরণ ক্ষেত্র ভারতবর্ষে তখনও কোটি কোটি অস্পৃশ্যের হাহাকারে বাতাস ভারি হয়ে থাকে। এই অধঃপতিত মানুষের জন্য যারা কিছুই করতে পারেননি বা করেননি, তাদের ঈশ্বর বা অবতার বলা যায় কি-না, তা নিয়ে লীলামৃত গ্রন্থ ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বিদ্রোহী স্বভাবের এবং আপোষহীন। তার বিদ্রোহের সূচনা ও প্রকাশ দেখা যায় বৈষ্ণব ভক্ত বা বৈরাগীদের বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। লীলামৃত গ্রন্থে তার বিশেষ বিবরণ আমরা পাই। —"পদরজ: দূরে থাক দণ্ডবৎ নাই। প্রহার পীড়ন কর যাহাপূর্ব তাই॥ ঝোলা রাখি বৈষ্ণবেরা স্নানে পানে যায়। উজাড় করিয়া ঝোলা ঠাকুর ফেলায়॥ পিতৃকোলে থাকি হরি ক্রোধ করি বলে। ভণ্ডবেটা বৈরাগীরা দূরে যাবে চলে॥"— হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিণত বয়সের নানা কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট

মতামত ও নির্দেশ পাই। তার নিজের মুখে দেওয়া নির্দেশ লীলামৃত গ্রন্থের পাতায় আমরা দেখতে পাই এভাবে — "কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই। বেদ-বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইবেক যেই। না থাকুক ক্রিয়াকর্ম হরিতুল্য সেই॥" — অর্থাৎ বেদ ও অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ, আচার-আচরণ এসব কিছুকে তিনি পরিহার ও অস্বীকার করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও তার দেব-দেবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিজেকে হিন্দুধর্মের একজন বলে কখনও ভাবেননি। হিন্দুধর্মকে মানব মুক্তির পথে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি আজীবন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উর্ধে তুলে ধরে বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি কেন হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন?—স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর পতিত মানুষকে উদ্ধার বা মুক্ত করার যে ব্রত নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন হিন্দুধর্মীয় শিক্ষা সে কাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থি বলে তার উপলব্ধি হয়েছিল। সেজন্যই তাকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলিকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে। তিনি বুঝেছিলেন—পতিত জনগোষ্ঠির দুদর্শার কারণ পক্ষপাতদুষ্ট হিন্দুধর্মীয় নানা নীতি ও নির্দেশ। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। মানুষের চিত্ত এমনভাবে শাসন করেছে, যাতে, শোষণ ও যন্ত্রণা প্রতিরোধ বিহীন হয়। মানুষ যেন তাদের জীবন-যন্ত্রণাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে অলীক পরকালের সুখ-স্বর্গলাভের আশায় বিভোর থাকে। — এইসব চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা হয় সুবিধাভোগীদের শোষণ নির্যাতন দীর্ঘায়ত ও চিরস্থায়ী করার জন্য। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার অনুশীলন ও বর্ণাশ্রম প্রথাকে ব্যবহার করা হয় এই হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে।

হরিচাঁদ ঠাকুর বর্ণাশ্রম প্রথার গণ্ডি ভেঙে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে মেলানোর সংগ্রামে ব্রতী হন। এবং এই কাজে তিনি সফলতা লাভ করেন। লীলামৃত গ্রন্থে তার পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়। — "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সাহা, শুদ্র সাধু নর। ছত্রিশ বর্ণের লোক হল একত্তর॥ বা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুণ্ডু, পাল, ঝালো, মালো। নমশূদ্র, সাহা, সাধু, একত্র হইল"॥ — এ হলো ভাগ করে শাসন-শোষণ করার ব্রাহ্মণ্যবাদী অপকৌশলের বিরুদ্ধে ঐক্যের জন্য তার উদাত্ত আহ্বান। যে ডাকে মানুষ অভাবিত সাড়া দিলেন। — সময়ের বিচারে যা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার সামিল।

চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অসীম সাহস ও তেজস্বীতা, নিজের বিশ্বাসে স্থির ও অটল থেকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি যে বিশ্বস্ত কর্মি ও ভক্তবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে গোটা মানব সমাজের মুক্তির দিশা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এই পর্যায়কালে হরিচাঁদ ঠাকুরের মণীষার যে বিচ্ছুরণ হতে থাকে, তা এক কথায় অনবদ্য ও অকল্পনীয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়াধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিলেন তার ১২টি মূল নির্দেশ বা আজ্ঞার ভিত্তির উপর। নির্দেশগুলি থেকে যে নির্যাস বেরিয়ে আসে তা এক বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ। যে বস্তুবাদ প্রচলিত ধর্ম ভাবনা তথা ভাববাদী যুক্তিহীন ধর্ম ভাবনার সম্পূর্ণ

বিপরীত। সে দিক দিয়ে মতুয়াধর্মকে প্রচলিত ধারণার ধর্মমত বলা যায় না। এ হলো এক ধর্ম বিপ্লব — ধর্মের মোড়কে বস্তুবাদী দর্শনের কঠিন অনুশীলন। এ প্রশ্নে লীলামৃতের ভাষা হলো,—"ধর্মের নামেতে জীব অধর্ম করয়। ধর্ম দুঃখী তাই দেখি শ্রীহরি উদয়॥"

মতুয়াধর্মে পরলোক বা পরকালের হাতছানির কোন গল্প নেই। তাই, পরকালে সুখের জন্য ইহকালে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারকে উপেক্ষা করা মেনে নেবার কুমন্ত্রণা দেয় না। পরকালের হাতছানি মানুষকে প্রতিবাদ বিমুখ করে এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের পথ মসৃণ করে দেয়। তাই বলে মতুয়াধর্ম ন্যায়-অন্যায় বা সুকর্ম-দুষ্কর্মকে এক করে দেখে না। পরলোকের অলীক কল্পিত ভয় দেখিয়ে মানুষকে নিরস্ত করার ভুল কৌশলও নেয় না। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত স্পষ্ট শিক্ষা দিয়ে জানায়—"কর্মক্ষেত্রে সংসারেতে কর্ম মহাবল। সকলেই পায় কর্ম অনুযায়ী ফল॥ কর্মকর্তা ফল ভোগে না হয়ে কি যায়। সুকর্ম-দুষ্কর্ম ফল অবশ্যই হয়॥" — অর্থাৎ সংসার জীবনে সর্বদাই সৎপথে থেকে ভাল কাজ-কর্ম করার শিক্ষা দেয়। খারাপ কাজ ও অসৎ চিন্তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়।

সংসার জীবনে সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ ও প্রগতির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর যে উপদেশ দিলেন তার মর্মার্থ হলো — (১) সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার দূর করা। সত্য, চেতনা ও চরিত্র গঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। (২) শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান হওয়া। (৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী হওয়া। (৪) ব্যভিচার থেকে হাজার যোজন দূরে থাকা । (৫) নারী শিক্ষা। (৬) প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। — শুধু পতিত-দলিত সমাজ নয়, এ বিষয়গুলি গোটা মানব সমাজের টিকে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য, প্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং এই সক্রিয়তাই হরিচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতুয়াধর্ম। — "করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম ল'য়ে নিজ নারী। গৃহে থেকে ন্যাসী বানপস্থী ব্রহ্মচারী॥ গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়। বানপ্রস্থী পরমহংস তার তুল্য নয়॥..... পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে। পর দুঃখে দুঃখী সদা সচ্চরিত্র রবে॥..... যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে। সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে॥..... দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন। তার দরশনে সব তীর্থ দরশন॥..... জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা। ইহা ছাড়া আর যত, সব ক্রিয়াভ্রষ্টা॥" এছাড়াও তিনি "নিজ হাতে ব্যবসায় করে হরিচাঁদ। বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান॥..... বাণিজ্য করিয়া হরি শিখায় সকলে। গৃহী কত বড় হয় ব্যবসায়ী হলে॥..... অর্থ ছাড়া বাক্য যথা প্রলাপ বচন। অর্থ শূন্য গৃহীজনে জানিবে তেমন॥..... 'অর্থ অনর্থের মুল' কহে যেই ভণ্ড। অর্থের জানে না অর্থ সেই অপগণ্ড॥.....মম পিতৃদেব প্রভু শ্রী হরি ঠাকুর। তিন বাক্য বলে মোরে মধুর মধুর॥ এক বাক্যে বলে শিক্ষা দিতে পুত্রগণে। দ্বিতীয় অতন্দ্র থাকি বিজয়ে মরণে॥" — ইত্যাদি সব যুগান্তকারি নির্দেশ দিয়েছেন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ — যা আজ ধর্মীয় বাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এসব নীতিকথাগুলি মুখে বলেই হরিচাঁদ তার দায় শেষ করেননি। চাষাবাদ করে, ব্যবসা করে, নিজে সংস্কারমুক্ত জীবন যাপন করে, ছেলে গুরুচাঁদকে স্কুলে পাঠিয়ে — অর্থাৎ হাতে কলমে সবকিছু

করে জীব-জগতকে শিক্ষা দিয়েছেন।

নির্দেশগুলি খুটিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, মতুয়াধর্মে ব্যক্তিমুক্তির কোন বাসনা ব্যক্ত করা হয়নি। এই ধর্মে রয়েছে সমষ্টিগত ভাবনা এবং সমষ্টি বা সামাজিক মুক্তির পথনির্দেশ। সেজন্যে সন্ন্যাস-বানপ্রস্থের মত ব্যক্তিমুক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা এখানে কোন ঠাঁই পায়নি। মতুয়াধর্মে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণকে লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবার মত কাপুরুষতা বলে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রশ্নে লীলামৃতের শিক্ষা হলো — "আদর্শ দেখাতে গোরা সন্ন্যাসী হইল। সংসারের জীব কিন্তু সংসারে রহিল॥ জগত তারিতে এসে সংসার ছাড়িল। সংসার 'সং'-সার হলো জগত ডুবিল॥" সুন্দর, সুখী সংসার গড়ার লড়াই হলো মতুয়াধর্মের অনুশীলন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে সাধারণ মানুষের সংসার ব্রত, সংসার জীবন বা সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ডই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ও ব্রত। সংসারি মানুষেরাই এই বিশ্বের অপূর্ব সৃষ্টি জীব জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সংসার হলো বিশ্ব প্রকৃতির দিগন্ত বিস্তৃত সংগঠনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠতম একক। দেশ ও জাতি গঠন এবং প্রগতির নিউক্লিয়স। লীলামৃত গ্রন্থ বলে "গার্হস্থ্য আশ্রমে ধরি নরকূল বাঁচে। গৃহীকে করিয়া ভর-সকলে রয়েছে॥ সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্বধর্ম সার। গৃহীকে বিলাবে মুক্তি শ্রীহরি আমার॥"—এই ধর্মীয় ঘোষণা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা রহিত।

মতুয়াধর্মে ঈশ্বর বা ভগবানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক। লীলামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে—"যে যাহারে ভক্তি করে, সেই তার ঈশ্বর।" আবার শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে বলা হয়েছে— "যে যাহারে উদ্ধার করে, সেই তার ঈশ্বর।" দুই গ্রন্থে দুই সংজ্ঞার মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্নতা, বিভেদ বা বৈষম্যের গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবত: তার কোন অর্থ নেই। কারণ সাধারণভাবে 'ভক্তি' শব্দটার মধ্যে এক ধরনের অন্ধত্ব বা যুক্তিহীন ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু লীলামৃত গ্রন্থ যুক্তিহীন ভক্তির কথা বলেনি। এই গ্রন্থে দু'টি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—'জ্ঞানমিশ্রভক্তি' এবং 'শুদ্ধ-প্রেমভক্তি'। অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধার কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে— যে শ্রদ্ধার আসন রচিত হয় কর্মগুণে, মানব সমাজের সেবার মধ্য দিয়ে। ফলে, যে পতিত সমাজ হরিচাঁদের স্পর্শে প্রগতির আলোর সন্ধান পেয়েছে, তাদের একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান যে হরিচাঁদ তাতে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক ও বক্তব্য উল্লেখ করে যতই ধর্মগ্রন্থটিকে এবং মতুয়াধর্মকে যুক্তিবাদের উপর দাঁড় করানো হোক না কেন, কেউ কেউ ঐ একই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করে নানা অলৌকিক কাহিনীরও অবতারণা করতে পারেন এবং বস্তুতঃ তা করা হয়। ফলাফল হিসাবে মতুয়া, সাধু, পাগল, গোঁসাই এবং সাধারণ মতুয়া ভক্তরা ঐসব অলৌকিক নানা কাহিনীর কথাই বেশি বেশি জানেন এবং তাতেই মজে আছেন। এ অবস্থা যে প্রকারান্তরে হরিচাঁদ ঠাকুরকে অবমাননার সামিল—একথা মতুয়া সমাজ যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে পারবেন, ততই মঙ্গল। 'সখ্য প্রেমে বিশ্বনাথের প্রাণরক্ষা', 'মৃত গরুর জীবন দান', বা 'হীরামনের শ্রীরামরূপ দর্শন' লীলামৃত

গ্রন্থের ইত্যাদি আখ্যানগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও প্রচার না হবার কারণে মতুয়াভক্তদের মনে এসব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থের রচয়িতা রসরাজ তারক সরকার। রসরাজ ছিলেন বাংলার বিখ্যাত কবিগান গায়ক। মূলকথা বলার পূর্বে বা মূল সিদ্ধান্তে আসার আগে নানা ধরনের উদাহরণ, শাস্ত্রকথা, উপমা ও বর্ণনার দ্বারা হেঁয়ালী সৃষ্টি করা কবিগান গায়কদের অতি পরিচিত শিল্পগুণ। ফলে, লীলামৃত গ্রন্থ রচনাকালে রসরাজের জীবনের এইসব নানা ধারণা, অভ্যাস ও শাস্ত্রশিক্ষার প্রভাব যে কিছু পরিমাণে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তার জানা ও শোনা নানা কাহিনীর বর্ণনাতে তার নিজস্বতার ছোঁয়া যে কিছু পরিমাণে লেগেছে, গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে তা বোঝা যায়। ফলে, অনেক মতুয়ার ক্ষেত্রে মতুয়াধর্মের সারমর্ম আত্মস্থ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বহুক্ষেত্রে তারা ভুল করে ফেলছেন বলে মনে হয়। মতুয়াধর্মের আলোচনায় এসব বিষয়াদি হিসাবে রাখা প্রয়োজন।

উদাহরণ হিসাবে উপরে আলোচিত তিনটি আখ্যান যদি ভালভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়া যায়, তাহলে আমরা দেখবো—সেখানে মৃত গরু বা মৃত মানুষ বাঁচিয়ে তোলার কথা বলা হয়নি। বর্ণনা করা হয়েছে মুমূর্ষ রোগী বাঁচিয়ে তোলার কাহিনী। হীরামনের শ্রীরামরূপ দর্শনের কথাটিও হরিচাঁদ ঠাকুর পাত্তা দেননি। এসব ব্যাপারে লীলামৃতে লেখা শব্দগুলি হলো — "বিশের হয়েছে রাতে বিসূচিকা ব্যাধি। মৃতপ্রায় সবে করিতেছে কাঁদাকাঁদি।।" বা "বাঁচিবে না ঐ গরু প্রায় মরে গেছে। উঠে এস থাক কেন বলদের কাছে।।" ঠিক এসব শব্দগোষ্ঠীই লেখা হয়েছে লীলামৃত গ্রন্থে।

হীরামন হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে শ্রীরামরূপ দর্শন করে সাময়িক মূর্চ্ছা গেলেন। ধাতস্থ হয়ে তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে ঘটনা বর্ণনা করে আরেকবার ঐ রূপ তাকে দেখাবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠাকুর এই কথায় কোন গুরুত্ব দেননি এবং তিনি যে ব্যাপারটি এড়িয়ে যান লীলামৃত গ্রন্থের কয়েকটি কথায় তা বোঝা যায়। — "প্রভু কহে কহি তোকে ওরে হীরামন। যদি কেহ কারো কিছু করে দরশন।। অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে। শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।।"

হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত জীব-জন্তুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন, কি পারতেন না — প্রশ্ন তা নয়। আমাদের বুঝতে হবে জীবন এবং মৃত্যু প্রকৃতির খেলা। এই পরিণতি শ্বাশত এবং সত্য। তাই, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার প্রকৃতি বিরোধি। হরিচাঁদ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির বা সৃষ্টির সাবলীল স্রোতধারা আরও সুন্দর করতে ও বহমান রাখতেই তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাই, আমাদের বুঝতে হবে— তিনি কখনই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন না।

হরিচাঁদ ঠাকুরের অমর বাণী হলো—"হাতে কা. মুখে নাম।" এই শব্দ চারটি নিয়ে নানা মুনির নানা ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো — সর্বক্ষণ শ্রীহরি ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে কাজ করে যাওয়া। অনেকে তাই-ই করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে 'জয় হরিচাঁদ, জয় হরিচাঁদ' নাম জপ্ করেন। —মনে হয় এই

ব্যাখ্যা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা এবং এক্ষেত্রে তা অন্ধত্ব বা যুক্তিহীন ভক্তির প্রকাশ। আমরা বরং আলোচিত অতি গুরুত্বপূর্ণ চারটি শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে বলতে পারি—তাহলো, হরিচাঁদ ঠাকুরের বাণী, নির্দেশ ও নীতি মেনে এবং স্মরণে রেখে সংসার ও সমাজ জুড়ে অহর্নিশ কাজ করে যাওয়া। হরিচাঁদ ঠাকুরের নীতি নির্দেশগুলি হলো: (১) এক নারী ব্রহ্মচারি (২) পরপতি, পরসতী স্পর্শ না করা। (৩) সত্য কথা বলা। (৪) অকারণ জীব হত্যা না করা। (৫) পরনারীকে মাতৃজ্ঞান করা ও নারীকে সমানাধিকার দান। (৬) অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে, দুঃখীকে সহযোগিতা দান। (৭) জীবে দয়া ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্নশীল হওয়া। (৮) সমস্ত নারী-পুরুষের শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে যত্নবান হওয়া। (৯) নির্মোহ হয়ে কর্তব্য সমাধা করা। (১০) সাধন, ভজন, দীক্ষা, তীর্থ পর্যটন প্রভৃতি আচার সর্বস্বতা পরিত্যাগ করা। কানে মন্ত্র, দীক্ষা পরিত্যাগ করে 'ধরা ও মরা' প্রথার প্রচলন। অর্থাৎ বুঝিয়ে শিখিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শ ও জীবনাদর্শে সামিল করা বা হরিচাঁদের চরণে সমর্পিত করা। হরিচাঁদই হলেন মতুয়াদের একমাত্র গুরু, অন্য কেউ তার তুল্য নন। (১১) সৎসঙ্গের অভ্যাস গড়ে তোলা—তাস, দাবা, জুয়াখেলা পরিত্যাগ করা। (১২) শ্রম বিমুখতা ও অলসতা পরিত্যাগ করা প্রভৃতি। মুখে 'হরি-হরি' বলা না বলা বড় নয়, বরং হরিচাঁদ নির্দেশিত এসব গুণের অধিকারি একজন গৃহী হয়ে ওঠা আসল কথা। এসব গুণের অধিকারি কোন গৃহী যদি "না ডাক হরিকে, হরি তোমাকে ডাকিবে" (লীলামৃত)।

এতসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, 'আজও মতুয়াধর্ম একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি' — একথা মোটেই ভুল নয়। এই না পারার কারণ মতুয়াধর্মের মতাদর্শের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মতুয়াধর্মের মতাদর্শ অন্য ধর্মমতগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। তাই, কারণ খুঁজতে হবে হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী প্রজন্মের মূল বিশিষ্ট নেতা ও ধর্ম প্রচারকদের ভাবনা, লেখনী ও কাজের সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্যে।

শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থের উৎসর্গ বাক্যে লেখা হয়েছে—(হরিচাঁদ ঠাকুরের কল্যাণে) "মৃতপ্রায় হিন্দু প্রাণ পাইয়াছে।"—একথা হরিচাঁদ ঠাকুরের অমর সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা। লীলামৃত গ্রন্থখানির ভূমিকাতে আচার্য মহানন্দ হালদার এক জায়গায় লিখেছেন—"...হিন্দু রক্ষা পাইল। গণ্ডী হিসাবে হিন্দু ও হিন্দুধর্মের রক্ষা করা এবং বিরাট বিশ্বজীবনে শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণ শান্তি উপলব্ধি করানোই শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের অন্তর্নিহিত সত্য।" —মতুয়াধর্মে আচার্য মহানন্দ হালদারের অবদান তুলনাহীন। তার অমর সৃষ্টি শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত মতুয়াধর্মকে যারপর নাই সমৃদ্ধ করেছে। তবুও বিনয়ের সাথে বলা দরকার—উপরে উল্লিখিত তার কথাগুলি ভুল। তাই, ভুল ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলার প্রয়োজন। — মতুয়াধর্ম প্রচারকগণের মধ্যকার এইসব প্রাণপুরুষদের আবেগতাড়িত ও অসাবধানতা প্রসূত এমন কিছু কিছু মন্তব্য ও লেখনী মতুয়াধর্মের স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এবং চিন্তা-চেতনায় ও আচার-আচরণে মতুয়ারা হিন্দু ধর্মের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে বিকশিত হতে পারেননি, পারছেন না এখনও।

শ্রীধাম ওড়াকান্দি ও শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়ি থেকেও আচার-আচরণগত ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশ দেবার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতা দেখাতে পারেনি। তবে চেষ্টা যে ঠাকুরবাড়ি একেবারেই করেনি তা নয়। সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও ছিল। তবে বিগত দু'পাঁচ বছরের মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে কাজ এখন তাদের করতে হবে। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে আচরণ করে, অনুশীলন করে জীব-জগতকে শিক্ষা দিয়েছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে একাজ অনেকাংশে ব্যাহত ও ব্যর্থ হয়েছে।

আচার্য মহানন্দ হালদার ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুর মহাশয় তাঁদের কর্মজীবনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন (সূত্রঃ অনন্ত বিজয় পত্রিকা)। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন হিন্দুত্ববাদী এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আচার্য মহানন্দ হালদারের চিন্তা-চেতনার উপর শ্যামাপ্রসাদের ভাবনার প্রভাব যে কিছুমাত্রায় পড়েছিল তা বোঝা যায়। এবং এসব কারণেই তিনি 'মতুয়াধর্মকে হিন্দুধর্মের গণ্ডীবদ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন বা লীলামৃত গ্রন্থের উৎসর্গ বাক্যে 'মৃতপ্রায় হিন্দু প্রাণ পাইয়াছে' ইত্যাদি মত প্রকাশ পেয়েছে — যে মত বেঠিক। বরং এক্ষেত্রে আমরা লীলামৃত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের যে ভূমিকা হরিবর সরকার মহাশয় লিখেছেন, তা একবার স্মরণ করলে বুঝতে পারি বা অনুমান করতে পারি যে, হরিচাঁদ ঠাকুরকে হিন্দুধর্মের অবতার বা তার আন্দোলনকে হিন্দুধর্মের ধারাবাহিকতা হিসাবে দেখা, উল্লেখ করা এবং এসব উক্তি ও লেখনী হরিচাঁদের মোটেই পছন্দ ছিল না। যে কারণে তার ভাবনা, চিন্তা ও কাজ সম্পর্কে রসরাজ তারক সরকার যা লিখেছিলেন, তার কিয়দংশ পাঠ শ্রবণ করে হরিচাঁদ তা বাতিল করে দেন। এবং বই আকারে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এমনকি মৃত্যুঞ্জয়কে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ না করার জন্য কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেন। তার আপত্তির কারণ আর অনুমানের বিষয় থাকে না, যদি তার গোটা নির্দেশাবলী ও অনুশীলনকে আমরা সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করি। রসরাজ তারক সরকারের লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপির অপ্রয়োজনীয় কাল্পনিক কাহিনীর কাট-ছাঁট করা রূপ হলো বর্তমান লীলামৃত গ্রন্থখানি। মতুয়াধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের মতাদর্শ ও অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে যে এক মহা বিদ্রোহ, একথা আমাদের এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

আচার্য মহানন্দ হালদার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমকালীন রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবও তাকে অনেকটাই আচ্ছন্ন করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থখানির মধ্যে। গুরুচাঁদ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের সাথে কখনই সহমত হতে পারেননি। অথচ আচার্য হালদার মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসা করতে যে বিশেষ দু'তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা অনৈতিহাসিক। গুরুচাঁদ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনের এবং অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন; অথচ শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতের পাতায় আচার্য মহানন্দ হালদার বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনকে সমর্থন করে ফেলেছেন। এমন দু'একটি প্রশ্নে তিনি যা লিখেছেন তা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নাকচ করার সামিল। ঐ গ্রন্থে সংরক্ষণ প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীকে কৃতিত্ব দেবার

ঘটনাও প্রমাণ করে তার উপর কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব। এ জাতীয় প্রভাব ও প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ং মহানন্দ হালদার লীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন— "গ্রন্থকর্তা কবি রসরাজ মহোদয় কবিগান করিতেন এবং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ তাহার প্রিয় পাঠ্য ছিল, সুতরাং শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত রচনাকালে অজ্ঞাতসারে তাহার প্রিয় পাঠ্যের ভাবধারা নিজ গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"—আচার্য মহানন্দ হালদারের রচনাও যে রসরাজের মতই কিছুই পরিমাণে প্রভাবিত তা পাঠকদের বুঝতে হবে। তাই, গ্রন্থ দু'টির বিষয়াদির মূল্যায়ণের সময় আমাদের এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকা জরুরি, নতুবা সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। —আর এ সবের ফলে যে বিভ্রান্তি ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এখনই তা দূর করা প্রয়োজন।

আমাদের বুঝতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির শর্ত হলো অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, ঘৃণার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃত্ব, অন্ধত্বের বিরুদ্ধে চেতনা সৃষ্টি করা। হরিচাঁদ ঠাকুর সেই বিকল্প পথের সন্ধান দেন এবং আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মতুয়াধর্ম।

গৃহীর ধর্ম এবং সন্ন্যাস-বাণপ্রস্থের ধারণা পরস্পর বিরোধি। ঠিক তেমনি বস্তুবাদী ভাবনা এবং আধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী ধারণা এই দু'টি বিষয়, মতবাদ বা দর্শনও পৃথক এবং একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে সর্বনাশা আধ্যাত্ববাদী-ভাববাদী হিন্দুধর্মের প্রভাব বলয় থেকে পতিত মানুষকে মুক্ত করে জীবনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বস্তুবাদী গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর, কিন্তু অনেকেই বলার চেষ্টা করেন যে, আধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণে মতুয়াধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোচনায় আমরা দেখেছি এসব ভাবা ঠিক নয়। কারণ হরিচাঁদ ঠাকুর সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, বাস্তব-অবাস্তব —এমন সব পরস্পর বিরোধি ধারণা ও বিষয়াদি মিলিয়ে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে এক খিচুড়ি মত ও মতবাদ পরিবেশন করেছেন—এসব ভাবা, বলা ও লেখা এই মহামণীষীর প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ! হরিচাঁদ ঠাকুর ন্যায়-নীতি ও সত্যের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ় ও অটল ছিলেন। সত্য চেতনায় কোন মাঝামাঝি বা আধা-আধি ব্যাপার থাকে না। কোন সমঝোতার মধ্যপন্থা থাকে না। সত্য সব সময় আপোষহীন। সেই জন্যই মতুয়াধর্ম প্রকৃতই এক ধর্ম বিপ্লব। আর হরিচাঁদ ঠাকুর হলেন — আসল হরি, পূর্ণানন্দ হরি।' ❐

# খোলা চিঠি

শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (বড়বাবু) তারিখঃ ২১-০৩-০৯
সংঘাধিপতি, মতুয়া মহাসংঘ
শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি
উঃ ২৪পরগনা।

শ্রদ্ধাষ্পদ

আশাকরি ভাল আছেন। কিছু অবিচারের কথা জানিয়ে আপনার কাছে বিচার চেয়েছিলাম। জানতে পারিনি আপনি কতটা কি করেছেন। তাই, আজ আবার এই চিঠি লিখছি।

মতুয়াদের স্বার্থে, গোটা উদ্বাস্তু মানুষের স্বার্থে, মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্বে মতুয়াদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি ঠাকুরনগরে ঐতিহাসিক অনশন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। অনশন আন্দোলন সফল ও সার্থক করে তুলতে যথাসাধ্য করি — যা গোটা মতুয়া সমাজ ও উদ্বাস্তু মানুষেরা জানেন।

আপনার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লি যাওয়া, থাকা ও অন্যান্য ব্যবস্থা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি ও প্রধানমন্ত্রির সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য যা কিছু করার, সবই করি।

রিপাবলিকান পার্টির সাংসদদের মাধ্যমে অনশনের কথা প্রধানমন্ত্রির কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সাংসদদের ঠাকুরনগর আসার ব্যাপারে যা করার করেছিলাম। ভোটাধিকার ও নাগরিকত্বের অধিকারের দাবিতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলাম রিপাবলিকান পার্টির দুই সাংসদকে দিয়ে। এসবই আপনি জানেন।

সুনামিতে বিপর্যস্ত মতুয়াদের পাশে দাঁড়াবার জন্য মতুয়া মহাসংঘ আমাকে আন্দামান পাঠায়। আমি সে কাজ করেছি। কি করেছি, একটি ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে তার বিবরণ বহু মানুষের সাথে আপনিও জেনেছেন। মতুয়া মহাসংঘের অন্যকোন নেতা এই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেননি বা সাহসে কুলোয়নি।

উড়িষ্যার দেশ ছাড়ার নোটিশ পাওয়া ১৫৫১ জন মতুয়ার বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সহযোগিতা করার জন্য মতুয়া মহাসংঘ আমাকে যোগ্য মনে করে সেখানে পাঠায়। ১৫ দিন সেখানে থেকে মিটিং-মিছিল সংঘটিত করে এক বড় আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের সেই প্রচেষ্টা রুখে দেবার কাজে আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। মতুয়ারা উপকৃত হন।

হেলেঞ্চায় কলেজের নাম হরি-গুরুচাঁদের নামে করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব মতুয়া মহাসংঘ আমার উপর ন্যস্ত করে। সেই আন্দোলনে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল তা সবার জানা। এই আন্দোলন যখন জমে উঠেছে; তখন কোন এক অজ্ঞাত কারণে মতুয়া মহাসংঘের এক শীর্ষ কর্তাব্যক্তি মতুয়াদের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করেন এবং কার্যত কলেজের নাম পরিবর্তন আন্দোলন, নাগরিকত্বের আন্দোলন প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। মতুয়াদের আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনা হয় শুধুমাত্র মহোৎসবের আঙিনায়।

চক্রান্তকারি ভদ্রলোক মতুয়া সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে থাকেন যে, সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস রাজনীতি করেন, তাই, মতুয়ারা যেন তার সাথে কোন যোগাযোগ না রাখেন। সভা-সমিতিতে যেন সুকৃতিকে ডাকা না হয় ইত্যাদি। ঠাকুরবাড়ির আশ্রয়কে পুঁজি করে ভক্তপ্রাণ মতুয়াদের তিনি এভাবে সংকীর্ণ নিজ স্বার্থ ও লক্ষ্যে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। —যা বিস্তারিত জানিয়ে আমি আপনার কাছে বিচার চেয়েছি।

আমি রিপাবলিকান পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি ১৯৯৫ সাল থেকে। ঠাকুরনগরের অনশন আন্দোলন ২০০৪ সালে। তাই, মতুয়া সমাজ ও মতুয়া মহাসংঘ যখন আমাকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়, তখন আমার রাজনৈতিক পরিচয় জেনে বুঝেই দেয় এবং এসব কাজে আমার রাজনৈতিক পরিচয় যে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি গোটা মতুয়া সমাজ তা জানেন, বরং কিছু ক্ষেত্রে তা বিশেষ সুবিধা পেতে সমর্থ হয়।

তবুও এসব কথা যখন তোলা হতে থাকে; তখন আমি আপনাকে এমনই এক লিখিত চিঠি দিয়ে জানাই যে, আপনি চাইলে আমি রিপাবলিকান পার্টি ত্যাগ করে আপনাদের অর্থাৎ মতুয়া মহাসংঘের নির্দেশ মত কাজ করতে চাই। মতুয়াদের সাথে থাকতে চাই ও মতুয়াদের জন্য কাজ করতে চাই। আমার লিখিত চিঠির জবাবে আপনি জানান যে, আমি যেন কোনভাবেই রিপাবলিকান পার্টি ত্যাগ না করি। আপনি আরও বলেছিলেন যে, "শুধুমাত্র তোমার জন্য একমাত্র রিপাবলিকান পার্টির সাংসদরা মতুয়াদের নানাভাবে সহযোগিতা করছেন।"— তাই, আমি যেন ঐ দল ত্যাগ না করি।

মতুয়াদের স্বার্থে এইসব আন্দোলনে আমি যেমন আছি, পাশাপাশি লেখার মাধ্যমে, বই প্রকাশের মাধ্যমে, গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে আমি মতুয়াধর্ম আন্দোলনকে বিকশিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 'গ্রামবাংলার রেনেসাঁর জনক গুরুচাঁদ ঠাকুর' পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে — যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে এক নতুন রূপে বুঝতে শেখেন। আজকাল সভা-সমিতিতে বক্তারা যে সব তথ্য ব্যবহার করেন, ঐ পুস্তিকার মাধ্যমে আমি তা প্রথম আমজনতার দরবারে নিয়ে আসি। 'পতিত মুক্তি আন্দোলন' বইটি ও 'মতুয়াধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব' পুস্তিকা প্রভৃতি বই ও নানা প্রবন্ধ-প্রতিবেদনের মাধ্যমে মতুয়াধর্ম ও আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি এসব করছি ও করেছি তার জন্য প্রশংসা দাবি করিনি ও করছি না। কিন্তু

আমার বিরুদ্ধে মাত্র একটি লোক যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরবাড়িতে থাকার সুযোগ ব্যবহার করে, আমি তা বন্ধের দাবি জানিয়েছি আপনার কাছে।

লক্ষ্য করার বিষয় — যিনি আমার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে জল ঘোলা করছেন, তিনি গত বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য কলংকিত করেছেন। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস পতিত মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থি কর্মসূচী নিয়ে দল পরিচালনা করে।

আমি কখনই মতুয়া মহাসংঘের কোন পদ দাবি করিনি, ইচ্ছা প্রকাশ করিনি, আজও তেমন কোন ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। অথচ ঐ ব্যক্তিটি — মতুয়া মহাসংঘের উপদেষ্টা কমিটি ও কেন্দ্রিয় কমিটিতে এমন সব ব্যক্তিকে জায়গা করে দিয়েছেন যারা সরাসরি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত। কেউ কোন রাজনৈতিক দলের এম. এল. এ ও পার্টি পদাধিকারি; আবার কেউ কেউ লোকসভার প্রার্থী পদের দাবিদারদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন পার্টির সদর দফতরে টিকিট পাইয়ে দেবার জন্য। সুপারিশ করছেন মতুয়া মহাসংঘের পদাধিকারি হিসাবে।

সবাই স্বীকার করবেন ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক কদর বেড়েছে। গুরুত্ব বেড়েছে। খবরের শিরোনাম দখল করছে — যা আগে হয়নি। এসবের পিছনে নিশ্চয়ই অনেক কারণ আছে। এসব অনেক কারণের মধ্যে সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাসের কাজ ও চেষ্টা একটা কারণ তা আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের নিশ্চয়ই অজানা নয়। মতুয়া সমাজে মহোৎসব বাড়ার জন্য নিশ্চয়ই এটা হয়নি। হয়েছে মহোৎসব বহির্ভূত যে আন্দোলনটুকু মতুয়ারা করেছেন তার জন্য। তাই—এটাই স্বাভাবিক কোন ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুন, সুকৃতির নাম এই পরিবর্তনের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দেওয়া যাবে না।

ঠাকুরবাড়ি থেকে বলা হচ্ছে — মতুয়াদের জন্য যারা কাজ করবেন মতুয়ারা তাদের সাথে থাকবেন। একই সাথে এটাও বলা হচ্ছে, ঠাকুরবাড়ি রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকবে। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ কিছু হয় না। উচিতও নয়। পতিত মুক্তি আন্দোলন মতুয়া আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন। বিবেচনা করে, তাই, তাদের পক্ষ নিতেই হয়। আর 'মতুয়াদের জন্য কাজ করা'—কথাটার ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। শুধুমাত্র কিছু সরকারি টাকা বরাদ্দ করাই কি মুখ্য ব্যাপার, না মূলকথা অন্য কিছু?

*"তথাকার ভক্তগণে প্রভু ডেকে বলে।*
*নিরোদবাবুকে ভোট দিও এক দলে॥"*

নিরোদবিহারী মল্লিককে ভোট দেবার নির্দেশ স্বয়ং গুরুচাঁদ তার অনুগামীদের দিয়েছিলেন ১৯২৩ সালের নির্বাচনে। তাহলে আজ আপনারা হাত গুটিয়ে, মুখ বন্ধ করে থাকবেন কেন?—রাজনৈতিক আকাশ ঠাকুরবাড়িকে যে সুযোগ করে দিয়েছে, পতিতদের স্বার্থে আপনারা তা ব্যবহার কেন করবেন না? বিভিন্ন বড় দল লোকসভা

নির্বাচনে ঠাকুরবাড়ির পছন্দমত প্রার্থীর নাম সুপারিশ করার সুযোগ দিয়েছিলো। উপযুক্ত ও মনোমত প্রার্থীর নাম সুপারিশ না করে মতুয়া মহাসংঘ সে সুযোগ হাতছাড়া করেছে। বর্তমান বাস্তব অবস্থায় খুব বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই, দু'একজন পছন্দের প্রার্থীর নাম অন্ততঃ সুপারিশ করা যেত। বনগাঁ, রানাঘাট ও অন্যান্য কেন্দ্রে বড় দলগুলি মতুয়া বিরোধি প্রার্থী দাঁড় করেছে। মতুয়া সমাজকে মতুয়া বিরোধি প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য হবার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আশা করে থাকবো—ভোটদান প্রক্রিয়ায় সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। ঠাকুরবাড়ি থেকে মতুয়াদের বন্ধুস্থানীয় প্রার্থীদের ভোট দেবার আহ্বান জানানো হবে—এ আশা পতিত সমাজ নিশ্চয় করতে পারে।

প্রণাম নেবেন।

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস
ফোন ঃ ৯৭৩৩৮৮৮০৭১

# মতুয়াধর্ম এক ধর্মবিপ্লব

হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়াধর্ম হলো এক ধর্ম বিপ্লব। ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত পূর্বেকার সমস্ত ধ্যান-ধারণা বাতিল ও অস্বীকার করে মতুয়াধর্ম চিন্তা, চেতনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

'ধর্ম নহে দূরে কোথা ঘর ছেড়ে খোঁজা বৃথা,
আপনার ঘরে ধর্ম আছে ঘুমাইয়া।"

মতুয়াধর্মের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করতে হলে, অন্য ধর্ম, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মীয় নির্দেশের মৌলিকতা বুঝতে হবে। যদি তা বোঝা না যায়, তাহলে, মতুয়াদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হবার বিপদ হতে বাধ্য—যা বাস্তবতঃ অনেকটা হয়েছেও।

শুধু যে মতুয়াধর্মের সাথে হিন্দুধর্মের পার্থক্য তা নয়। বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম, জৈনধর্ম, খৃষ্টধর্ম, শিখধর্ম প্রভৃতি ধর্মের মূল নির্দেশগুলির সাথেও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা একেবারেই মেলে না। আসলে হিন্দুধর্মের নানা অনাচার, অন্যায় ও অমানবিক নির্দেশ ও রীতি নীতির বিপরীত প্রতিক্রিয়াতে অন্যান্য এইসব ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যে কারণে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের প্রভাবাধীন অঞ্চলেই সমস্ত ছোট বড় ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করার মোটামুটি ৬০০ বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় এবং তিনি অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের আন্দোলন শুরু করেন। তারই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় বৌদ্ধধর্ম। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে।

যীশুখৃষ্টের জন্মকাল থেকে ইংরেজী সাল গণনার শুরু। তাঁর আন্দোলন গৌতম বুদ্ধের আন্দোলনের পরিপূরক। ন্যায় ও সত্যের জন্যই এই আন্দোলন। যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করার প্রায় ৬০০ বছর পর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আরেক মহামণীষী হযরত মোহম্মদ। তিনি গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের মতই মানব কল্যাণের জন্য রক্তাক্ত লড়াই সংগ্রাম ও কাজ করে যান। শান্তির লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি কাজ করেন এবং বিশ্বজোড়া আরেক ধর্ম ইসলামের প্রবর্তন করেন।

অন্যদিকে হিন্দুধর্মের প্রাণ হলো বর্ণাশ্রম প্রথা—বিভেদ ও ঘৃণা। স্বয়ং ভগবান এই বিভেদমূলক শিক্ষার জনক বলে দাবি করেন। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে এই বিভেদ ও ঘৃণাকে ধর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার অনুশীলন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেকেই বলার চেষ্টা করেন যে, জন্ম নয়, কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা হয়েছে। —এটা কোন যুক্তি নয়, কুযুক্তি! রামায়ণে শম্বুক, মহাভারতের কর্ণ, ঘটোৎকচ, একলব্য—এরা জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও চারিত্রিক গুণে মহান হলেও তাদের শূদ্রের অসম্মান ভোগ করতে হয়েছে, ব্রাহ্মণ-

ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা তারা পাননি।

একটা পর্বে এসে হিন্দুধর্ম আর চতুর্বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সৃষ্টি করা হয়েছে পঞ্চম বর্ণ। অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্যরা যে শুধু স্পর্শের অযোগ্য ছিলেন তা নয়, এমন কি তাদের দর্শনের অযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করে লোকালয়ে তাদের গমনাগমন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে বাঁচবার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। বাংলার অনতিক্রম্য দুর্গম জল-জঙ্গল এলাকায় মশা-ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত সাপ ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মুখে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়।

এমন একটা সামাজিক পরিস্থিতিতে জল-জঙ্গল ঘেরা গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব এবং পতিত উদ্ধারের জন্যে তিনি হাতিয়ার করেন 'মতুয়াধর্ম'।

ব্রাহ্মণ শব্দটিতে এদেশের মানুষের অকারণ দুর্বলতা দেখা যায়। নিজেদের স্বার্থে ব্রাহ্মণরাই মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপন করেছেন। নানা গ্রন্থ ও নীতি-নির্দেশ তৈরি করে ধর্মের নামে তারা তা চালিয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের মহান, শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকারি বলে বর্ণনা করেছেন। মতুয়া ধর্মগ্রন্থ সেই চিরাচরিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে সদম্ভে ঘোষণা করলো—

ব্রাহ্মণ রচিত যত অভিনব গ্রন্থ।
ব্রাহ্মণ প্রধান মার্কা বিজ্ঞাপন যন্ত্র॥
............................................
ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠ এই নীতি বলে।
শূদ্র বলি ক্ষুদ্র করে অপর সকলে॥
কথা উপকথা কত সৃজন করিল।
ঘাটে মাঠে গাছে পথে দেবতা গড়িল॥

—তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমাজ এক পরগাছাশ্রেণী। সমাজ এবং দেশের জন্য তাদের উল্লেখযোগ্য কোন অতীত অবদান নেই বা শৌর্য বীর্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ শব্দটি আগামীদিনে গালি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। তারই আগাম ঘোষণা শোনা যায় মতুয়া ধর্মগ্রন্থের পাতায়—

আজ যারা ঘৃণা করে আগামীতে তারা।
ঘৃণিত হইবে সবে হয়ে মান হারা।।

ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দেশ ও সমাজের এই ভুল ধারণা থেকে মতুয়াদের একাংশ মুক্ত নন। তারা ভাবতে ভালবাসেন যে, হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষেরা ব্রাহ্মণ

ছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত ভেবে মনে মনে আহ্লাদিত হন। কিন্তু এই ধারণার পিছনে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রম কিছু দাবি করতে হলে নিশ্চিত প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। নমঃশূদ্র সমাজের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নমঃশূদ্র হিসাবে পরিচিত হবেন। কিন্তু তার মধ্যকার কেউ অন্যরকম কিছু দাবি করলে বা কাউকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে তারজন্য নিশ্চিত প্রমাণ জোগাড় করতে হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই।

মতুয়াধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত এবং শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত। হরিগুরুচাঁদের নীতি, নির্দেশ, কর্মজীবন এবং মতুয়াধর্মের নানা আলোচনায় তাই আমাদের এই দুই মহান গ্রন্থকেই আদর্শ ও সত্য হিসাবে মেনে নিতে হবে। এ প্রশ্নে মতুয়া বা আলোচকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকা চলে না। তবে গ্রন্থের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা, প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হতে পারে। পাঠকদের ঐসব আলোচনা থেকে সঠিক দিক-নির্দেশ খুঁজে নিতে হবে।

শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত গ্রন্থের 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদের পূর্ব পুরুষগণের পরিচয়' অধ্যায়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষদের উল্লেখ আছে। একথা ঠিক যে, তাতে হরিচাঁদের পূর্ব পুরুষগণকে মিথিলা প্রদেশবাসী ব্রহ্মবংশের মানুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি একটু খুটিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়লে জানা যায়—এই বংশের মানুষ রামদাসের আগের কারুর নাম কিন্তু জানতে পারা যায় না। ত্রিশূলধারী রামদাস জীবনের প্রথম দিকটা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। তার কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। পরে একটা সময়ে নবগঙ্গার তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নমঃশূদ্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ হন।

অর্থাৎ রামদাসের পূর্ব পুরুষগণের পরিচয় অনেকটা অনুমানভিত্তিক। জ্ঞানী গুণী মানুষ মাত্রেই ব্রাহ্মণ—এমন একটা চাপিয়ে দেওয়া ভুল ধারণা থেকে তার পূর্ব পুরুষদের ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকতে পারে। অথবা, যে অর্থে নমঃশূদ্রদের এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই যুক্তির পরম্পরায় রামদাসকেও ব্রাহ্মণদের জ্ঞাতি বলা হয়ে থাকতে পারে। লীলামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নমঃশূদ্ররা আসলে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ। বল্লাল সেন-এর চক্রান্তে তাদের জঘন্য জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এমন একটা মত সমাজে চালু আছে।

নমঃশুদ্র বীর্যবান, বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান,
বল্লালের কোপেতে জঘন্য।

রামদাস ও তার পূর্ব পুরুষগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তা বোঝা যায় তাদের জীবনাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকেই। অতীতে তো বটেই, এমনকি আজও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ মানুষেরা শ্রীচৈতন্য ভক্ত হন না। ত্রিশূল হাতে চলাফেরাও তাদের স্বভাব নয়। বরং সমাজের ব্রাহ্মণশ্রেণী শ্রীচৈতন্যের আদর্শের পরিপন্থি। তারা মনে করেন—শ্রীচৈতন্যের মতবাদ ও আন্দোলনের ফলে 'ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ',—এই ধারণায়

আঘাত লাগে। আধুনিক মত —পুরীর মন্দিরের ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা এই কারণেই ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করেছিলেন।

তাছাড়া নানা কথোপকথনে বোঝা যায়—লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বসবাসকালে ব্রাহ্মণদের সাথে রামদাসের ভাল সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণরাও কখনও তাকে স্বজাতি বলে উল্লেখ বা গ্রহণ করেননি। বরং তার মুখে সব সময় ছিল নমঃশূদ্রের শৌর্য-বীর্য ও গৌরবের কথা, যাতে তার নাড়ীর যোগ বুঝতে কষ্ট হয় না।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, পুত্র চন্দ্রমোহনের জন্য কন্যা খুঁজতে কেন তিনি ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে ঘুরলেন? —লোক শিক্ষার জন্য ধর্মীয় গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু কথা ও ঘটনার উল্লেখ থাকে। ঐ সময়কালে বাস্তবতঃ কুলীন ব্রাহ্মণরা এত বেশি সংখ্যায় বিয়ে করতেন যে, স্ত্রীর নাম ও শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা খাতায় লিখে রাখার প্রয়োজন হতো, নতুবা তারা মনে রাখতে পারতেন না কোথায় কোন স্ত্রী আছেন। এমন সময়কালে ব্রাহ্মণ সুপাত্রের জন্য ঘরে ঘরে কন্যা খুঁজে বেড়ানোটাও অস্বাভাবিক মনে হয়। নমঃশূদ্র বলেই ব্রাহ্মণরা চন্দ্রমোহনকে কন্যাদান করেননি।

মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্রের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের চিন্তার দৈন্যতা ও চরিত্রের হীনতা প্রকাশ করা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে। রামদাস নিজ মুখে দ্বিজদের বলছেন—

সে সব সাধুর বংশ, সাধক পরমহংস
নমঃশূদ্র কুলে লয় জন্ম।

রামদাস একথার মধ্য দিয়ে নিজের বংশ পরিচয় নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ হেন মানুষ কন্যা খুঁজতে ব্রাহ্মণ ঘরে যাবেন, এমনটা মনে হয় না। এছাড়াও লীলামৃত গ্রন্থে লেখা হয়েছে— "নীচ্ হয়ে করিব যে নীচ্-এর উদ্ধার"। ফলে, হরিচাঁদ ঠাকুর যদি ব্রাহ্মণ হবেন, তাহলে একথা তিনি নিজ মুখে কেন ঘোষণা করবেন! গুরুচাঁদ ঠাকুরও নিজেই নিজের জাত-পরিচয় ঘোষণা করে বলেছেন—

নমঃশূদ্র কুলে জন্ম হয়েছে আমার।
তাই বলে আমি নহি নমোর একার॥

"তাই, ঠাকুরবাড়ির বংশতালিকাতে এখনও যেভাবে মৈথিলী ব্রাহ্মণ লেখা হয়, এটা এক ধরণের দুর্বলতা, অবমাননাকর ও অসম্মানজনক। এ জিনিস পরিবর্তন করা দরকার। এ পরিচয়ে স্বয়ং হরিচাঁদের সমর্থন নেই।

মতুয়াদের মধ্যে অনেকেই হরিচাঁদকে হিন্দুধর্মের অন্যান্য নানা অবতারের ধারাবাহিকতায় দেখে থাকেন। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের রচিত লীলামৃত গ্রন্থ বিবৃত বহু ঘটনার সঠিক উপলব্ধি করতে না পারার জন্য এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন বাংলার বিখ্যাত কবিগান গায়ক।

মূলকথা বলার বা মূল সিদ্ধান্তে আসার আগে নানা ধরনের উদাহরণ, শাস্ত্রকথা, উপমা ও বর্ণনার দ্বারা হেঁয়ালী সৃষ্টি করা কবিগান গায়কদের অতি পরিচিত শিল্পগুণ। মতুয়া ধর্মগ্রন্থে সেসব কথার সরাসরি উল্লেখ আছে। যেমন—

মানব জীবনে আমি দেখি সেই ভাব।
রূপক করিয়া লেখা কবির স্বভাব॥

—তাছাড়া কবিগান গায়করা সাধারণতঃ চর্চা করেন হিন্দুধর্মের নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নিয়ে। বিশেষ করে রসরাজ তারক সরকারের প্রিয় পাঠ্য ছিল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। ফলে, হরি লীলামৃত গ্রন্থ রচনাকালে তারকচন্দ্রের জীবনের এইসব নানা শাস্ত্র শিক্ষার প্রভাব কিছু পরিমাণে না পড়াই অস্বাভাবিক। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রভাব যে শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত গ্রন্থের রচনায় পড়েছে, সেকথা আচার্য মহানন্দ হালদার লীলামৃত গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছেন, সেখানে উল্লেখ করেছেন। ফলে, অনেক মতুয়ার ক্ষেত্রে মতুয়াধর্মের সারাংশ আত্মস্থ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বহুক্ষেত্রে তারা ভুল করে ফেলছেন।

লীলামৃত গ্রন্থে রাম, কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য সবার উল্লেখ আছে। তাদের অবতার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নানা কথার আড়ালে তারকচন্দ্র যখন লেখেন—

নিত্যানন্দ হরি, কৃষ্ণ হরি, গৌরহরি।
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি॥

...............................................

এই ওড়াকান্দি আজ যেবা আসিয়াছে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব অতিক্ষুদ্র তার কাছে॥

—এ কথায় আমরা কি বুঝি? নকলকে নকল না বলেও হরিচাঁদের আগে 'আসল' শব্দটা জুড়ে দিয়ে তারকচন্দ্র আমাদের নকল চিনিয়ে দেন। পরম্পরা আর থাকে না। কারণ আসল ও নকলে পরম্পরা হয় না, থাকে বৈপরীত্য। ভদ্রভাষায়, সৌজন্যতার সীমা অতিক্রম না করে, অতীব সূক্ষ্মভাবে রসরাজ তারক সরকার আমাদের যে গভীর শিক্ষা দিয়েছেন, তা খুঁজে নিতে হবে।

দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপণ।
গৌরাঙ্গের প্রেমবাণে ধরা ডুবে যায়।
সেই প্রেম শুষ্ক হলো কলির মায়ায়॥

...................................................

দুরন্ত কলির মায়া প্রকৃতি সহায়ে।
ভাঙ্গিল প্রেমের হাট 'কুস্রোত' বহায়ে॥

অর্থাৎ তারক সরকারের সুস্পষ্ট অভিমত হল— শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হল—তা সমাজের ক্ষেত্রে, সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। —যে মতবাদের পরিণতি 'কুস্রোত' বা মন্দের দিকে প্রবাহিত, তাকে কখনও হরিচাঁদের মতবাদ বা মতুয়াধর্মের পাশাপাশি রাখা যায় না।

কৃষ্ণ আসি, গোরা আসি, অনেক কহিল।
বলাবলি সার হলো ভিত্তি ফাঁক র'লো॥
গার্হস্থ্য আশ্রমে ধরি নরকূল বাঁচে।
গৃহীকে করিয়া ভর সকলে রয়েছে॥
তাই দেখি গৃহধর্ম সকলের মূল।
এইখানে বুদ্ধদেব করিলেন ভুল॥
এই ভুল এতকাল সারা নাহি হল।
ভুল সেরে মুক্তি দিতে হরিচাঁদ এল॥

—সেজন্য হরি-গুরুচাঁদ এক ও অদ্বিতীয়। তার সাথে অন্যকোন অবতার বা মহাপুরুষের তুলনা না টানাই উচিত। অন্যরা মানব সমাজের জন্য যেটুকু করেছেন, তারা তার মধ্যেই থাকুন; কিন্তু হরিচাঁদ যে অনন্য, তা যেন সবাই মনে রাখেন। মতুয়া ধর্মগ্রন্থে হরি-গুরুচাঁদের সঠিক অবস্থান বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে নীচের দুটি লাইনের বক্তব্যে—

আমি জানি গুরুচাঁদ এল কোন জন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু করে ধ্যান তাহার চরণ।।

মতুয়া ধর্মগ্রন্থে এমন বহু কথা আছে যা আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, হিন্দুধর্মের নীতি-নিয়মের পরম্পরায় বা হিন্দু ধর্মের পরিপূরক হিসাবে মতুয়াধর্ম সৃষ্টি করা হয়নি, বরং মতুয়াধর্মের মতাদর্শ ও লক্ষ্য হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও কল্যাণকামী। তাহলে মতুয়া ধর্ম কি এবং কি তার মতাদর্শ ও লক্ষ্য— তা বোঝাতে নীচের চারটি লাইনের উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
অবতীর্ণ হরিচাঁদ আসি অবণীতে।।
সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্বধর্ম সার।
গৃহীকে বিলাবে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।

—শ্রীশ্রী হরিলীলামৃতের প্রস্তাবনায় মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে মতুয়াধর্মকে এভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রচলিত ধর্মমত শিক্ষা দেয় যে, সংসার ও জীবন অনিত্য। তাই তুচ্ছ। সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার কোন মুল্য নেই। যা কিছু পাবার তা আছে পরপারে,

মৃত্যুর ওধারে। এ শিক্ষা হল প্রচলিত শোষণ, ঘৃণা, অন্যায় ও অবিচারমূলক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কৌশলের অংশ। মানুষের চিত্তকে শাসন করে অন্যায়-অত্যাচারকে বিনা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মেনে নেবার শিক্ষাদান। চলমান শোষণমূলক ব্যবস্থার আয়ু বাড়িয়ে নেবার কায়দা। শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনকে এই জঘণ্য কৌশলের অঙ্গ বলে লীলামৃত গ্রন্থে বলা হলো—

নাম ধর্ম নিয়ে এলো শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
অনিত্য সংসার বলি জীবে শিক্ষা দেয়॥
আদর্শ দেখাতে গোরা সন্ন্যাসী হইল।
সংসারের জীব কিন্তু সংসারে রহিল॥

.......................................................

জগত তারিতে এসে সংসার ছাড়িল।
সংসার 'সং' সার হলো, জগত ডুবিল॥

প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীতে মতুয়াধর্ম জীবনটাকেই গুরুত্ব দিল। সংসার জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার পরামর্শ দিলো। হরি-গুরুচাঁদ আদর্শ সংসার জীবন যাপন করলেন। মানুষকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দের পথ দেখালেন। আপাতভাবে মনে হতে পারে কথাগুলি সহজ। তা কিন্তু নয়। মতুয়াধর্ম গ্রন্থ তাই বলছে—

তোমাদের কালে যাহা সহজে সম্ভব।
আমাদের কালে ছিল অতি অসম্ভব॥

—হাজার বছরের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই বাস্তববাদী চিন্তা সহজ ছিল না। এই ভাবনা ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। পুরোপুরি বিপরীত ভাবনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার এক যুগান্তকারি প্রচেষ্টা এবং হরিচাঁদ তাতে সফল হন।

মার্কস ও এঙ্গেলস এর মত মনীষীরা পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মমতগুলোকে অস্বীকার করেছিলেন। ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন, তা কিন্তু তাদের একক উপলব্ধি ছিল না। মার্কসবাদ হলো—বহু মনীষীর, বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার। দার্শনিক হেগেল থেকে শুরু করে বহু মনীষীর সঞ্চিত জ্ঞান তারা তাদের ভাবনার পুঁজি হিসাবে পেয়েছিলেন। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে বিচ্ছিন্ন নিরক্ষর হরিচাঁদের সে সুযোগ ছিল না। একক মনীষায় তিনি যে তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন ও প্রচার করলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় এবং মৌলিক। মতুয়া দর্শন হলো ধর্মীয় মোড়কে বস্তুবাদের কঠিন অনুশীলন!

মৃত্যুর ওপারের গল্প ও পরজন্ম তত্ত্ব হলো প্রচলিত ধর্মমতের বীজমন্ত্র। পরপারের ভয় ও লোভ দেখিয়ে মানুষের বশ্যতা অর্জন, শোষণ ও বঞ্চনার প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে বেদনাশূন্য ও প্রতিরোধহীন সহজতর করার কৌশল। গার্হস্থ্য ধর্মতত্ত্ব এই সব ধর্ম ব্যবসায়ীদের এক মুখের মত জবাব দিয়েছে।

গার্হস্থ্য ধর্ম হলো গৃহীর জীবনাদর্শের দিক নির্দেশনা। মতুয়াধর্ম তার অনুগামীদের চরিত্র গঠনের দিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। কারণ যত ভাল কথা, কাজ ও কর্মসূচী নেওয়া বা ভাবা হোক না কেন, সচ্চরিত্র মানুষ ছাড়া কোন মহৎ প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখে না। মতুয়াধর্ম তাই বলছে—

সংসারে সংসারী থাক তাতে ক্ষতি নাই।
চরিত্র পবিত্র রাখি সত্য বলা চাই॥

.............................................

লৌকিক সম্বন্ধে যদি আপন স্বজন।
চরিত্রেতে পবিত্রতা না করে রক্ষণ॥
তার সাথে খাওয়া বসা, মতুয়ার নাই।
জাতিভেদ বলিলে তো এই অর্থ পাই॥

.............................................

পরনারী মাতৃজ্ঞানে দূরেতে থাকিবে।
পরিহাস বাচালতা কভু না করিবে॥
মদ, গাজা নাহি খাবে, করিবে না চুরি।
তাস, দাবা, জুয়াখেলা সব দাও ছাড়ি॥

.............................................

পবিত্রতা, সত্যবাক্য, মানুষের বিশ্বাস।
তিন রত্ন যার আছে হরি তার বশ॥

.............................................

পর পতি পর সতী স্পর্শ না করিবে।
না ডাক হরিকে, হরি তোমাকে ডাকিবে॥

—মতুয়াধর্ম চারিত্রিক গুণ বলতে সততা, সত্যবাক্য, পবিত্রতা, সাহসিকতা, উদ্যম, বিশ্বাস এবং সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের উপর জোর দেয়। মতুয়াধর্ম ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে—'এক নারী ব্রহ্মচারী।' —মতুয়াধর্ম মানব সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে যুক্তিবাদী হতে পরামর্শ দেয় এবং এমনকি সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করে। তাই, গুরুচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করে লেখা হয়—

প্রভু কয় এই কষ্ট সহি কি কারণ।
অবশ্য রাস্তা আমি করিব গঠন॥

হরিচাঁদ অন্ধভক্তি ও গুরুবাদের মাধ্যমে মানুষকে বশীকরণ করার কৌশলের স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে শিক্ষা দেন। বহুযুগ ধরে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের চিত্ত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ মানুষের চিত্ত ও চেতনাকে যদি শাসন না করা যায়, তাহলে কোন মানব গোষ্ঠীকে বহুকাল

ধরে পায়ের তলে দাবিয়ে রেখে শাসন ও শোষণ করা যায় না। চিত্তশাসনের মাধ্যমে মানসিকভাবে কোন জনগোষ্ঠীকে দুর্বল করে না দিলে তারা বিদ্রোহ করবেই। তাই, চিত্তশাসনের কাজে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। হরিচাঁদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এইসব কলাকৌশল হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং মানুষকে চাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। তার স্পষ্ট ঘোষণা—

কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব॥

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শুধু মানসিকভাবে নয়, আর্থিকভাবেও মানুষকে পঙ্গু করে রেখে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। আজও যেমন সে চেষ্টা জারি আছে, অতীতেও ছিল। আজকের দিনের থেকে অতীত দিনে এই কাজ সফল করার জন্য কৌশলের কিছু রকমফের ছিল। অতীতে ধর্মের নামে নানা অনাবশ্যক আচার-অনুষ্ঠান এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং তাতে ব্রাহ্মণের কিছু আয়ের সংস্থানও হয়। পিতৃশ্রাদ্ধে সাধ্যের অতীত খরচ করলে মৃত পিতার স্বর্গ ও শান্তিলাভ হবে ইত্যাদি—এমন সব কথা ও নীতি-রীতির প্রচলন করা হয়। একজন খাঁটি বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে মতুয়াধর্মের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়ে বলেন—

বিবাহ শ্রাদ্ধের ব্যয় কমাইয়া দাও।
সাধ্যমত কাজ সকলে করাও॥

হরিচাঁদের সমসাময়িককালে নানা কুসংস্কার সমাজ জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তার মধ্যে সহমরণ ও বাল্য বিধবাদের সমস্যা ছিল এক মানবিক সমস্যা। রাজা রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে সরব হন। রামমোহনের ছেলেবেলা কেটেছিল তার বৌদির সান্নিধ্যে। বৌদির স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার আশ্রয়ে রামমোহন বেড়ে উঠেছিলেন। বৌদিকে তিনি মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। দাদা মারা যাবার পর, এই বৌদিকে সহমরণ বরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই নৃশংসতা রামমোহন নিজের চোখে দেখেছিলেন। একান্ত প্রিয়জনের প্রতি এই বর্বরতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। অসহ্য যন্ত্রণায় তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল এবং সহমরণ নামের বর্বরপ্রথা তুলে দেবার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দরবার করেন ও সহমরণ বিরোধি আইন তৈরি করাতে সফল হন।।

সমাজে অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল বাল্য বিধবাদের সমস্যা। অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেবার রীতি প্রচলিত ছিল সমাজে। কলেরা, বসন্তের মত মহামারীর প্রকোপ ছিল দেশ জুড়ে। ফলে, ঘরে ঘরে বাল্য বিধবার সৃষ্টি হতো। সহমরণ প্রথা উঠে যাবার পর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমাজে বাল্য বিধবাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। কিন্তু বিধবাদের পুনর্বার বিয়ে দেবার রীতি চালু ছিল না। সমাজে বিধবাদের ভাল চোখে দেখার শিক্ষাও ছিল না। সাধারণতঃ বিধবাদের অপয়া, কুলক্ষণা হিসাবে

গণ্য করা হতো। তাই, সমাজে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ সমাজ সহমরণ, বিধবা বিবাহ রদ, বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার আমদানি করে ও প্রচলন করে। হৃদয়হীন ব্রাহ্মণদের এইসব বর্বর নীতি প্রচলন করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার মরিয়া প্রয়াস। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা কায়েম রাখার তাগিদ। সারাদেশের সহস্র জনের একজন হিসাবে মিলেমিশে একাকার না হবার বাসনা। —প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ব্রাহ্মণ সমাজের বিষাক্ত হাওয়া ধীরে ধীরে অন্যান্য বর্ণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও কিছু মাত্রায় অনুপ্রবেশ করে। তারাও এইসব কুপ্রথার শিকার হন। বিধবা বিবাহ না দেবার রীতি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ সমাজ ছাড়াও অন্যান্য সমাজেও এক সমস্যা হিসাবে দেখা যায়।

বহুবিবাহ, বিধবার আধিক্য প্রভৃতি কারণে একটা সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজ সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সব কুপ্রথার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ সম্প্রদায়ের এই করুণ পরিণতি মেনে নিতে পারেননি। তাই, বহু বিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। বিদ্যাসাগরের কর্মজগত ছিল ব্রাহ্মণ সমাজ ভিত্তিক ও শহর কেন্দ্রিক। সীমিত পরিসর। তাঁর কাজের পরিধি ছিল কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে বহরমপুর শহর। একাজে তিনি যে সফল হয়েছিলেন তা বলা যাবে না। তবে তিনি এই কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিজের ছেলের সাথে একজন বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন। গোপনে গোবরডাঙাতে ওই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এতে বিদ্যাসাগরের মনের সুপ্ত মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

বাংলার দলিত পতিত সমাজও বিধবা সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সামাজিক সমস্যা ছাড়াও এ নিয়ে কৃত্রিম রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেন্সাস ও নানা রিপোর্টে পতিত সমাজের বিধবাদের সম্পর্কে নানা মিথ্যা অপবাদ ও দুষ্কর্মের কথা লিখে ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের মন বিষিয়ে দেয়, যাতে তারা পতিতদের সুনজরে না দ্যাখে ও উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে। ড. মীড সরকারি তথ্য পড়ে ব্রাহ্মণদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পারেন— যার বিবরণ মতুয়া ধর্মগ্রন্থে আমরা পাই এভাবে—

> বিধবা নারীর কথা লিখিয়াছে যাহা।
> মম কণ্ঠে উচ্চারণ নাহি হবে তাহা॥
> যতকাল এই দেশে লোক গোনা হয়।
> রিপোর্ট লিখিয়া হেন কটু কথা কয়॥

—এ সমস্যা গুরুচাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত চুপিসারে নিজের ছেলের সাথে বিধবার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রয়োজন হয়নি তাঁর। হরি-গুরুচাঁদ ছিলেন সমাজের স্বাভাবিক নেতা। তাই, তারা যে কোন সমস্যার সমাধানে মানুষকে সমাবেশিত করেছেন। এবং এজন্যেই তারা অনেক বেশি

সফল। হরি-গুরুচাঁদের আন্দোলনের বিস্তৃতি অনেক বেশি। নানা বর্ণ ধর্মের মধ্যে সে অমৃত স্রোত আজও প্রবহমান। অন্যান্য মনীষী ও মহাপুরুষদের থেকে এখানেই হরি গুরুচাঁদের আলাদা বৈশিষ্ট্য। গুরুচাঁদের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বর্ণনা পাই শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে এভাবে—

জাতির মঙ্গল তরে,     মীড যে প্রস্তাব করে
প্রভু তাহা লইলেন মানি।
বিধবার বিয়া দিতে,     প্রভু রাজি হলো তাতে
ভক্তগণে জানাল সে কথা।
সেই আজ্ঞা শুনি কানে     চিন্তা হল ভক্তগণে
কারো কারো ঘুরে গেল মাথা।
কেন হয় এ প্রকার     করেছি মিমাংসা তার
বিধবা বিবাহ প্রস্তাবনে।
সবে চুপ করি রয়     কেহ নাহি কথা কয়
চিন্তা হলো ভক্ত সমাজে।
বীরমূর্তি দেবীচাঁদ     হয়ে এলো আগুয়ান
করজোড়ে কহে গুরু রাজে।
পদে এই নিবেদন     শুন পতিত পাবন
মঙ্গলা মঙ্গল নাহি জানি।

..................................

বিবাহ বড়ই তুচ্ছ     ইহা হতে আরো উচ্চ
যদ্যপি কঠিন কিছু কহ।
দেহে প্রাণ যদি রয়     বলি আমি সুনিশ্চয়
দিব তাহা তুমি যাহা চাও।

..................................

দেবীচাঁদ মহাশয়     অতঃপর গৃহে যায়
বিবাহের জন্য ভারি ব্যস্ত।
ডাকি বলে ভক্তগণে     তোমাদের জনে জনে
এই কার্য করিলাম ন্যস্ত।

..................................

বিধবার বিয়া হল বিভিন্ন জেলায়।
প্রভু বলে থাক দেবী, আর বেশী নয়॥

..................................

বাল্য বিবাহের ফলে     বিষময় ফল ফলে
অকালে হারায় কত প্রাণ।

হরিচাঁদের জীবনকালে এদেশে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসা বিদ্যার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। তবুও যেটুকু যা হয়েছিল, তা ছিল শহর কেন্দ্রিক। অজ পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসার কোন আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছিল না. বললেই চলে। ফলে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে হরিচাঁদের সামনে উঠে আসে। সমস্যার গভীরতা দেখে তিনি কিন্তু পালিয়ে যাননি। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন এবং পীড়িত মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করেছেন—যার অসংখ্য উদাহরণ গ্রন্থ দু'টিতে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি নিজে চিকিৎসা করেছেন ও চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন—শুধু এটুকুই নয়, ব্যাধিমুক্ত থাকার বা ব্যাধি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। জামা-কাপড়, ঘর-বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছেন। ময়লা জল না খেতে ও মহামারীর সময়ে জল ফুটিয়ে খেতে উপদেশ দিয়েছেন। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষকে তিনি এভাবে ব্যাধিমুক্ত রাখার সযত্ন প্রয়াস নিয়েছেন। তার এই পরিচ্ছন্নতার আন্দোলনের রেশ অতি দরিদ্র মানুষের ঘরে প্রবেশ করলে আজও অনুভব করা যায়। মতুয়া ধর্মগ্রন্থে এইসব প্রচেষ্টা ও সাফল্যের বিবরণ পাওয়া যায়—

বহু লোক রোগাযুক্ত হয়ে বহু দেশে।
রোগ মুক্তি পাইতে তোমার ঠাঁই আসে॥

.................................................

শ্রীগুরু চরণ চিন্তা ভবব্যাধি নাশে।
ওড়াকান্দি এলে তার জ্বর থাকে কিসে॥

হরি-গুরুচাঁদ ব্যাধিমুক্ত থাকার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন শুধু তাই নয়। ব্যাধি আক্রান্ত মানুষকে সারিয়ে তোলার জন্য সাধ্যমত ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিতেন।

তিল চাউলের ছাতু পাকা রম্ভা দিয়া।
খাওয়াইস পিতলের পাত্রেতে মাখিয়া॥
সরিষার তৈল তার সর্ব অঙ্গে মেখে
নিশীভোরে সপ্তাহ খাওয়াস্ এ বালকে॥

.................................................

পান্থাভাত প্রাতঃকালে উদর পুরিয়া।
ইলিশ মাছের সাথে খাবে উদর ভরিয়া॥

.................................................

কাঁচা লঙ্কা পান্থাভাত তেলে জলে স্নান।
দিবারাত্রি বসে কর হরি নামগান॥

.................................................

গো'চনা মাটি দিয়ে মাখ নিজ গায়।

দূর না করিও তাহা যাবৎ শুকায়॥
শুকাইয়া গেলে তাহা ধুয়ে ফেল জলে।
তিল তেল মাখ পরে অতি কুতুহলে॥

—রোগ বিশেষে তেঁতুল গোলা জলসহ উপরে বর্ণিত নানা পথ্যের ব্যবস্থা দিতেন হরি-গুরুচাঁদ। আজকের আধুনিক মানুষের মনে হতে পারে—এসব ফালতু। বস্তুতপক্ষে এসব আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে মতুয়া ধর্মগ্রন্থে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়—

অদ্য হতে শতবর্ষ গত হলে পরে।
যদি কেহ এই গ্রন্থ সবে পাঠ করে॥
..............................................
তাই বলি অনাগত হে পাঠক মোর।
শুধু নিন্দাবাদে যেন করিও না সোর॥

—একটু ভাবলে সুধী সমাজ বুঝতে পারবেন যে, উপরে বর্ণিত নানা পথ্যগুলি, নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় আজও ব্যবহৃত হয়। কখনও তা হুবহু অতীতের মত, আবার কখনও তা পরিশোধিত অবস্থায়। সময়ের হিসাবে বিচার করলে চিকিৎসা বিদ্যায় হরি গুরুচাঁদের জ্ঞানের গভীরতা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রভু বলিতেন যদি রোগে মুক্তি চাও
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া খাও॥

—আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ও ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে হরি-গুরুচাঁদ বর্ণিত পদ্ধতি চালু আছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের এইসব চিকিৎসা জ্ঞান সে যুগের সমাজের মানুষদের যারপর নাই সেবা দিতে সমর্থ হয়েছে।

আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানসিক চিকিৎসার অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। হরি-গুরুচাঁদের সাফল্য ও পারদর্শিতার মূল ভিত্তি ছিল এখানেই। মানুষ বিশ্বাস করতেন—হরি-গুরুচাঁদের অভয় বাণী মিথ্যা হবে না। তাঁরা মানুষের এই আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মানুষের স্বার্থে তা কাজে লাগিয়েছেন। হরি-গুরুচাঁদের কথায় রোগগ্রস্ত মানুষেরা ভিতর থেকে চাঙা হয়ে উঠতেন এবং ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হতেন।

কিন্তু তাই বলে হরি-গুরুচাঁদকে সেকেলে বা অন্ধবিশ্বাসী বা তান্ত্রিক ভাবার কোন কারণ নেই। রোগ ব্যাধিতে তারা কখনও ডাক্তারের কাছে যাবার বিরোধিতা করেননি; বরং ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য উৎসাহিত করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে ওড়াকান্দিতে চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

প্রভুর ইচ্ছায় বাধা কেবা দিতে পারে।
জাতির মঙ্গল তরে আনিল মীডেরে॥
মীড যাহা বলে প্রভু সেই কাজ করে।
ভাব যেন প্রভু করে আজ্ঞা অনুসারে॥
আপনার কাজ প্রভু করে মীড দিয়া।
নরনারী কেহ তাহা পারে না বুঝিয়া॥

..........................................................................

দাতব্য চিকিৎসা হয় মীডের আবাসে।
দলে দলে দীন দুঃখী তার কাছে আসে॥

মীড সাহেব পাশ করা ডাক্তার ছিলেন। রোগগ্রস্ত মানুষকে গুরুচাঁদ মীডের কাছে যেতে উৎসাহিত করতেন। তবে ডাক্তারি বিদ্যার অতীত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী হলে আজকের দিনে যেমন হয়, অতীতেও তেমনি হতো। শেষ আশ্রয় হিসাবে গুরুচাঁদের কাছে আসতেন। গুরুচাঁদ তাদের নানা উপায়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। বহুক্ষেত্রে তিনি যে সফল হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। গুরুচাঁদ চরিতে তেমন কিছু কিছু মানুষের নাম ঠিকানার বিবরণ আছে।

যে যাই বলুন বা করুন না কেন, রোগীর জন্য ডাক্তারখানাই যে আদর্শ স্থান তা মতুয়াধর্ম প্রবর্তকেরা জানতেন। গুরুচাঁদের নেতৃত্বে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা তারই প্রমাণ। মহিলা —বিশেষ করে প্রসূতি মায়েদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যে কত জরুরি, তা গুরুচাঁদের থেকে বেশি আর কে বুঝতেন! যার জন্য ওড়াকান্দিতে 'মাতৃমঙ্গল' নামে চিকিৎসালয়ও তৈরি করা হয়।

মতুয়ারা হরি-গুরুচাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে খুবই গর্বিত। অতি অসাধারণ মানুষের কোন গুণ নিয়ে কারুর সন্দেহ প্রকাশ করা মানায় না। ইন্দ্রিয় ও যুক্তিগ্রাহ্য যে অসীম গুণের অধিকারি হরি-গুরুচাঁদ, তাতে ওদের মহিমা বৃদ্ধির জন্য আর কোন অলৌকিক ঘটনা প্রচারের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বাস্তবত সকল মতুয়ারা, মতুয়াধর্মকে গার্হস্থ্য ধর্ম বলে একবাক্যে মেনে নিলেও, গার্হস্থ্য জীবনে বা গার্হস্থ্য জীবন গঠনে হরি-গুরুচাঁদের অবিস্মরণীয় অবদানের থেকে অলৌকিক ঘটনাগুলিকে কেন এত বেশি গুরুত্ব দেন, তা বোঝা মুশকিল!

তবে এই ভুল ঝোঁকের জন্য শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থ দুটির কিছু প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। তবে আমার ধারণা—গ্রন্থ দুটির বক্তব্যের সারমর্ম ঠিকমত উপলব্ধি করতে না পারার কারণেই এই সব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন নীচের লাইনগুলির কথাই ধরুন—

যারে ব্রজ, আমি তোরে দিনু এই নড়ি।
ওঠ বলে বলদেরে মার গিয়া বাড়ি॥

হুংকার করিয়া ব্রজ করি হরি ধ্বনি।
বলদের পৃষ্ঠে বাড়ি মারিল অমনি॥
ওঠ ওঠ ওরে গরু রলি কেন শুয়ে?
অমনি উঠিয়া গরু গেল দৌঁড়াইয়ে॥

—এ জাতীয় বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে ঐ গ্রন্থ দু'টিতে। মতুয়ারা যেহেতু গ্রন্থ দুটিকে 'ধর্ম গ্রন্থ' হিসাবে মানেন, তাই তারা গ্রন্থের এসব কথা বিশ্বাস করেন।

বিশ্বাস এবং যুক্তি—শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব সময় যুক্তি ও সত্য নাও থাকতে পারে; আবার থাকতেও পারে। হরিচাঁদ ঠাকুর মৃতপ্রায় বলদটিকে যে সুস্থ করে তুলেছিলেন, একথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। কিন্তু তার থেকে এমন ধারণা গড়ে নেওয়া ঠিক নয় যে, হরিচাঁদ মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করতেন। তিনি তা পারতেন কি পারতেন না—প্রশ্ন তা নয়। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার প্রকৃতি বিরোধি। হরি-গুরুচাঁদ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির বা সৃষ্টির সাবলীল স্রোত বহমান রাখতেই তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ—এসব কৃত্রিমতাকে অস্বীকার করেন। হরিচাঁদ বলছেন—

তুই ত বিশ্বাস, আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্র-মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস॥
কেনবা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধাচারী, শৌচ মোর নাই মোটে॥
তিন বেলা সন্ধ্যা কর আরো স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক॥
কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই॥ — এখানে আমরা একান্ত বাস্তববাদী বা বস্তুবাদী হরিচাঁদকে পাই।

লীলামৃতের বাণী অমোঘ, সত্য। প্রকৃতির অমৃত রসে লীলামৃত ভরপুর। প্রকৃতির নানা জটিল রূপ ও খেলা হরি-গুরুচাঁদ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। জন্ম মৃত্যু হলো প্রকৃতির সনাতন রীতি। তাই, তারা কখনও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে কাজ করবেন না—এটাই ধরে নেওয়া যায়।

এছাড়াও গ্রন্থ দুটি নিয়ে আলোচনাকালে মতুয়াদের আরও একটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে, তাহলো—

বিশেষত ভক্ত গণে জানাইতে ভক্তি।
জগতের শিক্ষা হেতু এইসব যুক্তি॥
.......................................................
বোঝা মন বুঝিবারে কিবা প্রয়োজন।
সেও বুঝি জগতের শিক্ষার কারণ॥

—এই সব আলোচনাতে বোঝা যায় লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। শাস্ত্রগ্রন্থ এবং শিক্ষামূলক গ্রন্থসমূহে মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে ভয় ও শাস্তিমূলক কাহিনী এবং ভাল কাজে উৎসাহিত করতে প্রতিরূপ কাহিনী সৃষ্টির প্রথা বহু পুরনো। মতুয়া ধর্মগ্রন্থে এ-জাতীয় ঘটনা অত্যন্ত কম; কিন্তু তা যে একেবারেই নেই এমন হয়তো নয়। তবে বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির মত হরি-গুরুচাঁদের জীবন ও জীবন কাহিনী যে আজগুবি গল্পে ভরা নয়; বরং তা কঠিন বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, তাও বুঝতে হবে—

মীড কহে বড় কর্তা শুন মোর কথা।
ধর্মগ্রন্থ মাত্রে লিখে কত উপকথা॥
সে সব শিক্ষার লাগি করয় রচন।
প্রত্যক্ষ এসব নাহি ঘটে কদাচন॥
মীডের সন্দেহ দেখে প্রভু ডেকে কয়।
প্রত্যক্ষ ঘটনা এবে শুন মহাশয়॥

এসব আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী রূপে উঠে আসে অন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হরি-গুরুচাঁদ কি মানুষ ছিলেন; না তারা ছিলেন স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর? প্রশ্নের পর আবারও প্রশ্ন আসে—ভগবান বা ঈশ্বর কি, কি তার রূপ ও সংজ্ঞা ইত্যাদি।

হরি-গুরুচাঁদ মানুষ ছিলেন। মহামানব। মানুষের ঘরে জন্ম এবং রক্ত মাংসের মানুষ। জন্ম ও মৃত্যু ঘেরা মানুষ। শ্রীশ্রীলীলামৃত গ্রন্থে হরিচাঁদকে মানুষ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

যে মানুষ মম দেহে আবির্ভূত ছিল।
ঐযে সে মানুষ মানুষে মিশে গেল।

হরিচাঁদ হলেন সেই শক্তিধর পুরুষ—যিনি সমস্ত মানবিক গুণে সমৃদ্ধ জিতেন্দ্রিয়। তিনি সারা জীবন ধরে আলো বিকিরণ করে একদিন নিজে নিভে গেলেন; কিন্তু তার আলোচ্ছটা গোটা জগতকে আলোকিত করে রেখেছে, তা কখনও মুছে যাবে না।

তবে মতুয়ারা হরিচাঁদকে ভগবান বলায় বা ভগবান ভাবায় কোন ভুল করেন না। তারা তাকে সঠিক অর্থেই ভগবান বলেন। অমূল্য গ্রন্থ দু'টি ভগবানের ব্যাখ্যা করে বলেছে—

যে যাহারে ভক্তি করে, সে তার ঈশ্বর।
..................................................
বিশ্ব ভরে এই নীতি দেখি পরম্পর।
যে যাহারে উদ্ধার করে, সে তার ঈশ্বর।।

—মনে হয় না এ ভাবনায় বা সংজ্ঞায় কোন ভুল আছে। জীবের উদ্ধারে বহু

অবতারের জন্ম হয়েছে এই ভারতবর্ষে। সে সব অবতারের নাম তারকচন্দ্র লীলামৃতের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ভারতের পতিতদের তাতে কোন লাভ হয়নি। হাজার বছর ধরে তাদের দূরবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। উন্নতি বা প্রগতি হয়নি। পতিতরা মনুষ্যতর জীবন যাপন করে চলেছিলেন। তাই, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এবং শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতের নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করলে আর কোন দেব-দেবী, অবতার, ভগবান, পতিতের ভগবান নন, একমাত্র হরি-গুরুচাঁদ ছাড়া।

বিশেষ করে বাংলার পতিতদের উত্থানের সূত্রপাত হয় হরিচাঁদের চেষ্টার ফলে এবং গুরুচাঁদ পতিত উদ্ধার আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাই, সেদিক দিয়ে বিচার করলে পতিতদের একমাত্র ভগবান বা ঈশ্বর হরি-গুরুচাঁদ। তাদের আগে আর কোন মহাপুরুষ বা অবতার সত্যিকারের পতিত উদ্ধারে নামেন নি; কিছু করেননি বা করতে পারেননি।

অনেকে তর্ক করতে পারেন যে, শ্রীচৈতন্য ঐ একই কাজ আগেই শুরু করেছিলেন। আপাতভাবে তা হয়তো মনে হতে পারে। কিন্তু ধারণাটা ঠিক নয়। সমষ্টি নয়, শ্রীচৈতন্য ব্যক্তিমুক্তির বা নিজ মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন মানুষকে। সংসার জীবনের মহিমা নয়; সংসারকে অসার বলেছেন। এবং এর ফলাফল নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন বিরোধি। অর্থাৎ সমাজটা যা আছে, তেমন থাক। তাতে পতিতদের লাভ হয় না, বরং সর্বনাশ বহমান থাকে। স্থিতিশীলতায় তারাই লাভবান হন; যারা শিক্ষা, সম্মান, অর্থ ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে চলেছেন। হরি-গুরুচাঁদ ছিলেন পরিবর্তনের জনক, প্রগতির দিশারী—বিপ্লবী!

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম যে আচার সর্বস্ব ও শূচীবাইগ্রস্ত মতবাদ, তা মতুয়া গ্রন্থে বার বার বলা হয়েছে এবং এই মতবাদ যে শেষ বিচারে সমাজে 'কুস্রোত' প্রবাহিত করেছে তারও উল্লেখ আছে। হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক সময় মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছিলেন। অনেকেই মনে করেন—শ্রীচৈতন্যের আপাতসুন্দর মতবাদ বাংলায় ইসলামের অবাধ গতি অনেকটা প্রতিহত করতে পেরেছিল। যার ফলে, কার্যতঃ, অস্পৃশ্যদের একাংশ অস্পৃশ্য হিসাবেই গণ্ডিবদ্ধ থেকে যান।

কেউ কেউ শ্রীচৈতন্য এবং হরিচাঁদ শ্রীঠাকুরের মধ্যে যোগসূত্রতা প্রমাণ করতে লীলামৃত গ্রন্থ থেকে নীচে উল্লিখিত কথাগুলি ব্যবহার করে থাকেন।

> আর এক বাণী ছিল শূন্যবাণী সনে।
> শেষলীলা করিব আমি ঈশাণ কোণে।।
> নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার।
> অতি নিম্নে না নামিলে কিসের অবতার?

—শ্রীচৈতন্য খুন হয়েছিলেন পুরীতে। পুরী থেকে ঈশান কোণে অবস্থিত ওড়াকান্দি। তাই, এই ব্যাখ্যায় বলা হয় শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী জন্ম হরিচাঁদ রূপে ইত্যাদি।

— মহাজ্ঞানী রসরাজ তারকচন্দ্রের লেখাকে এভাবে বোঝার চেষ্টা এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ মতুয়া ধর্মের সামগ্রিক আদর্শের সাথে এই ব্যাখ্যা মেলে না।

জন্মান্তরবাদ বা পরজন্ম তত্ত্ব নিয়ে কচ্‌কচি মতুয়া ধর্মে নেই। মতুয়া ধর্মে দায়িত্ব পালনের পরম্পরার কথা বলা হয়েছে—

পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
গৃহী থেকে পারি কই ভাবিলেন চিতে॥
পবিত্র চরিত্র হবে গৃহস্থের মূল।
মূল ভিত্তি স্থূল হলে সব অনুকূল॥

.............................................

মম শক্তি ধরিবারে কারো সাধ্য নাই।
ধরিলে ধরিতে পারে মহাদেব সাই॥

.............................................

কায়া ছাড়ি এবে আমি বাহির হইব।
গুরুচাঁদ দেহে গিয়া আপনি মিশিব॥
আমা ভাবি গুরুচাঁদে ভক্‌তি করিবে।
গুরুচাঁদ মধ্যে তবে আমাকে দেখিবে॥

হরিচাঁদ পতিত উদ্ধারের মহাযজ্ঞ শুরু করে তার জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও মতাদর্শ স্থির করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। কাজ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। কিন্তু একজন মনীষীর জীবনকালে এই সুকঠিন ও দীর্ঘ কাজ সম্পন্ন এবং শেষ করা সম্ভব ছিল না। যার জন্য তিনি পরবর্তী নেতার খোঁজ করছিলেন। হীরামন, মৃত্যুঞ্জয়, গোলক, দশরথ, বিশ্বনাথ, ব্রজ, নাটু—অনেকের কথাই তিনি ভেবেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই যোগ্য ও বিশ্বস্ত। কিন্তু যে কাজের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করতে চাইছিলেন, সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য আরও বেশি যোগ্য মানুষের প্রয়োজন বলে ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজ পুত্র গুরুচাঁদকে তিনি মনোনীত করেন। তিনি তাঁর অনুগামী সবাইকে নির্দেশ দেন গুরুচাঁদকে মেনে চলতে ও সহযোগিতা করতে এবং যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে। এটা দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের পরম্পরা। হরিচাঁদের প্রবেশ গুরুচাঁদের মধ্যে— এসব ভাবনা বোকামি।

হরিচাঁদের সিদ্ধান্তের মর্যাদা রেখেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তার জীবনকালেই মতুয়া আন্দোলন দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পতিত মানুষেরা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নেবার পথ খুঁজে পান। তারা নিজেদের আবিষ্কার করেন ও আত্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠেন।

গুরুচাঁদের পর প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, গোপালচাঁদ সাধু, বিপিন গোঁসাই, আচার্য মহানন্দ হালদার প্রমুখের যৌথ প্রচেষ্টায় মতুয়া আন্দোলন দেশব্যাপী ডানা প্রসারিত

করতে থাকে।

'হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব খণ্ডের লেখা থেকে উপরে উদ্ধৃত চারটি লাইনের প্রথম দু'টি বাক্য মতুয়াদের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু তারা পরের লাইন দু'টি মনোযোগ দিয়ে দেখেন না বা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন না। আমার মনে হয়—উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় লাইনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তৃতীয় লাইনটি উপস্থাপনার প্রয়োজনে আঙ্গিক হিসাবে অন্য লাইনগুলির অবতারণা করেছেন তারকচন্দ্র। সেজন্য মতুয়াদের উচিত তারকচন্দ্রের কলমে স্বয়ং হরিচাঁদ নির্দেশিত ঐ তৃতীয় লাইনটির বক্তব্য আত্মস্থ করা এবং সেমত কাজ করা।

বাক্যটি হলো— 'নীচ হয়ে করিব যে নীচ-এর উদ্ধার'—এ কথার মধ্য দিয়ে হরিচাঁদ এক যুগান্তকারি নির্দেশ জারি করেছেন মতুয়া সমাজকে। তা হলো—পতিতদের নিজের উদ্ধার নিজেদেরকেই করতে হবে। একমাত্র পতিতরাই পতিত উদ্ধার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। অন্য কোন সমাজ বা ব্যক্তি, বিশেষ করে উচ্চবর্গ বা উচ্চবর্গের কোন মানুষ পতিতদের উদ্ধার করতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা এই কাজের দাবি জানিয়েছেন, তারা যত মহান হোন না কেন, কাজে সফলতা পেতে পারেন না; কাজে সফলতা পাননি। একটু খুটিয়ে দেখলে বোঝা যায়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল মার্কস একই কথা বলেছেন—সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম একমাত্র সর্বহারা মানুষেরাই। অন্যরা তা পারেন না। পুঁজিপতি, বুর্জোয়া, এমনকি মধ্যবিত্তরাও যে তা পারেন না, সেকথা মার্কসবাদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের দখলে এবং তার পরিণতি যে কি, তা সবাই আমরা দেখছি। সর্বহারা উদ্ধারের পরিবর্তে তারা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে 'কুস্রোত' প্রবাহিত করে রাজত্বকাল শেষ করেছে।

ড. আম্বেদকরের আত্মোপলব্ধিও তাই। তিনি বলেছেন 'উচ্চবর্ণের কোন মানুষের নেতৃত্বে দলিত উদ্ধার আন্দোলনে আমি বিশ্বাস করি না।' কংগ্রেস, গান্ধী ও তাদের অনুগত নেতাদের সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে আচার্য মহানন্দ হালদারের উপলব্ধির প্রকাশ একটু ভিন্নতর হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে অস্পৃশ্যতা মোচনের আন্দোলনে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর ভূমিকাকে অনেকটা বড় করে দেখেছেন, এভাবে—

> উন্নত কি অনুন্নত সবে মোরা হিন্দু।
> ইহাদের মধ্যে ভেদ নাহি এক বিন্দু॥
> দুর্বুদ্ধি করিয়া ভাগ ইংরাজে করিল;
> আজ হতে হিন্দু বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল॥
> সমস্ত ভারতবর্ষে তফসিলী যত।
> আসনের সংখ্যা বেশি পেল এই মত॥
> মহাত্মা গান্ধীর কাছে আসন ব্যাপারে।
> তফসিলী সবে ঋণী ভারত মাঝারে॥

—কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, হরি-গুরুচাঁদ বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন— যে বর্ণাশ্রম প্রথা মোটেই ইংরেজদের সৃষ্ট নয়। বিপরীতে মহাত্মা গান্ধী বর্ণাশ্রম প্রথার পক্ষে ছিলেন। বর্ণাশ্রম কুপ্রথা পতিতদের মরণ ফাঁদ। অস্পৃশ্য প্রশ্ন নিয়ে গান্ধী শুধুই রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন। সে সব তথ্য এখন জলের মতো পরিষ্কার। ড. আম্বেদকরের প্রভাব থেকে দলিতদের টেনে বের করে এনে তিনি তাদের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করেছিলেন।

আইন সভায় তফসিলীদের আসন বাড়াবার যে কৃতিত্ব গান্ধীকে দেওয়া হয়েছে তাও সঠিক নয়। গান্ধীর যে অনশন আন্দোলনের ফলে পূণা চুক্তি হয়েছিল, সেই অনশন আন্দোলন ছিল তফসিলীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কেড়ে নেবার দুরভিসন্ধিতে। গান্ধী সে কাজে সফল হলেও মূলতঃ ড. আম্বেদকরের জন্যই তফসিলীরা কিছু বেশি আসন পূণা চুক্তির মাধ্যমে পেয়েছিলেন। মনে হয় এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর ষড়যন্ত্র মহানন্দ হালদার মহাশয় ঠিকমত ধরতে পারেননি।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অথবা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনের প্রশ্নেও আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয়ের বক্তব্য সমর্থন করা মুশকিল। তিনি গুরুচাঁদ চরিতে লিখেছেন—

আর এক কাণ্ড হয় চির স্মরণীয়।
রাজা বলে বঙ্গভঙ্গ রদ করি দিও॥
দুই বঙ্গ হলো এক বাঙালির সুখ।
রাজধানী গেল দিল্লী এই যাহা দুখ॥

আমরা জানি গুরুচাঁদ চরিত মূলতঃ গুরুচাঁদের জীবন সংগ্রামের দলিল। কিন্তু এক্ষেত্রে হালদার মহাশয় গুরুচাঁদের ভাবনা ও কাজের বিপরীতে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস, বিচার ও মত প্রকাশ করে ফেলেছেন—যা না হলেই ভাল হতো।

বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে গুরুচাঁদ ইংরেজ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কংগ্রেস বা উচ্চ বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন ও বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ঐসব আন্দোলন বর্ণহিন্দুদের স্বার্থের আন্দোলন এবং তাতে গোটা কৃষক সমাজ ও পতিতদের সর্বনাশ হবে। বরং বঙ্গভঙ্গ হলে পতিত হিন্দু ও মুসলমান প্রজা কৃষকরা উচ্চ বর্ণহিন্দু জমিদারদের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবেন বলে গুরুচাঁদ মনে করতেন। তাই, মুসলমানদের সাথে জোট বেঁধে তিনি উচ্চবর্ণীয় স্বার্থের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এই আন্দোলন যাতে যৌথভাবে করা যায়, তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজ পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে মুসলমান নেতা, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের কাছে পাঠান এবং যৌথ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। গুরুচাঁদ চরিতের ভাষায়—

নমঃশূদ্র আর মোরা যত মুসলমান।
ঠিক হলো মোরা নাহি দিব যোগদান॥

আমি জানি সেই মতে দেশে আসে শশী।
নমঃশূদ্র মুসলমানে করে মিশামিশি॥

নমঃশূদ্রদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনে এবং অসহযোগ আন্দোলনে ভিড়ানোর জন্য কংগ্রেস নেতা অম্বিকাচরণের ফন্দি গুরুচাঁদ চরিতে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে এভাবে—

ওড়াকান্দি সন্নিকটে ঘৃতকান্দি গাঁয়।
কায়স্থ ব্রাহ্মণ কিছু বসতি তথায়॥
তাহাদের সহযোগে সভা মিলাইয়া।
নমঃশূদ্রগণে নিবে দলে ভিড়াইয়া॥

—অম্বিকাচরণের গরম গরম ভাষণ শুনে নমঃশূদ্রদের মেজাজ গরম হয়। তারা ইংরেজ বিরোধি আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু তারা তো বড়কর্তা গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্মতি ছাড়া কিছুই করতে পারেন না! তাই, দল বেঁধে ওড়াকান্দির ঠাকুর বাড়ীতে গুরুচাঁদের কাছে অনুমতি আদায় করতে আসেন। এরপরে এই আন্দোলন সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া হল—

অতঃপর মহাপ্রভু কহিলেন ডাকি।
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ রক্তবর্ণ আঁখি॥

..........................................................

কি বলি দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়।
শত্রু কি বান্ধব এরা চেনে নাক হায়!
আরো বলি শুন কথা কিছু মিথ্যা নয়।
দরিদ্র ধনীতে পথে কিবা ভাব হয়॥
এক সঙ্গে দুই জন চলে যদি পথে।
ধনী দেয় নিজ বোঝা দরিদ্রের মাথে॥

..........................................................

হঠাৎ দরদ কেন জাগিয়া উঠিল।
হঠাৎ দরদী বন্ধু নহে কিন্তু ভাল॥

..........................................................

দেশ কারে বলে বাপু, মাটি কি মানুষ।
কোন দিনে কেহ তাহা করিয়াছ হুস?

..........................................................

নিপীড়িত জাতি যত আছে বঙ্গ দেশে।
চিরদিন কাটে দীন দরিদ্রের বেশে॥
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে, অর্থ ক্ষেত্রে, অধিকার নাই।

সব অধিকার কেড়ে নিছে উচ্চবর্ণ ভাই।।
কোন কালে এতদিন উচ্চবর্ণ সবে।
অনুন্নত জনে নাহি দেখে ভ্রাতৃভাবে।।

অম্বিকাচরণের চক্রান্তে শুধু যে এলাকার নমঃশূদ্র মানুষেরা ওড়াকান্দিতে গুরুচাঁদের বাড়ি গিয়ে তাকে ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন, তাই নয়। বাংলার বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গুরুচাঁদকে পত্র লিখে ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুচাঁদ, পতিত ও মুসলমান কৃষক এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে ঐ আন্দোলনে সামিল হতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন—'যাদের পরণে এক ফালি বস্ত্র, আহার্য মোটা ভাত—তাদের বর্জন করার আছে কি?' —এসব ঐতিহাসিক তথ্যাদি গুরুচাঁদ চরিতে আচার্য মহানন্দ হালদার নিজেই বর্ণনা করেছেন। তারপরেও বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে গুরুচাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে তিনি বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন — যা না হলেই ভাল হতো।

মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, আচার্য মহানন্দ হালদারের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রভাব তার লেখনীর এই অংশে পড়েছে (তিনি এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন) বা হরি-গুরুচাঁদের শিক্ষাকে তিনি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। তবে আচার্য মহানন্দের কীর্তি অবিস্মরণীয় ও অমর। এমন দু-একটি বিষয় তার মহাকীর্তির উজ্জ্বল গায়ে সূক্ষ্ম কালির আঁচড় মাত্র।

প্রমথরঞ্জন ঠাকুর মহাশয়েরও গান্ধী ও কংগ্রেস এবং শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হয়েছিল। কংগ্রেস তাকে এবং গোটা পতিত সমাজকে ঠকিয়েছে—জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চয়ই তা বুঝেছিলেন। মুখে, বিভিন্ন লেখায়, প্রেস বিবৃতিতে তিনি তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। তাই, হরি-গুরুচাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে বর্তমানকালের সমস্ত সংগ্রামে, বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মহাসংগ্রামে উচ্চবর্ণ নেতৃত্বকে অস্বীকার করে পতিতদের নিজ সমাজের নেতৃত্বে সমাবেশিত হবার চেষ্টা জারি রাখতে হবে। হরি-গুরুচাঁদের শিক্ষার আলোকে শত্রু-মিত্র পৃথক করতে শিখতে হবে এবং সম্ভাব্য সব মিত্রপক্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালাতে হবে।

বলা হয়—ভগবান রামচন্দ্রের জন্মের অনেক আগে রামায়ণ রচিত হয়। অনেকটা সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, যাত্রাপালার মত। আগে পুস্তক বা পালা রচনা করা হয় এবং পুস্তকে বর্ণিত চরিত্র অনুযায়ী থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংলাপ বলেন, হাসেন, কাঁদেন ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত বা শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থ সেভাবে রচিত হয়নি। হরি-গুরুচাঁদ তাদের বাস্তব জীবনে যা বলেছেন, করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, তারই সারাংশ যথাসম্ভব অবিকলভাবে মানব সমাজের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে — যাতে মানুষ তা অনুসরণ করতে পারেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলন মতুয়াধর্ম আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো বটেই, কিন্তু তা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। হরিচাঁদ বিদ্যা আন্দোলনের সূচনা করলেন—

বয়স সপ্তম বর্ষ পরিপূর্ণ হলো।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদে নিকটে ডাকিল॥
বলে শুন বাপধন বলি তব ঠাঁই।
নমঃশূদ্র কূলে দেখ বিদ্যাশিক্ষা নাই॥
আমার প্রাণের ইচ্ছ তোমাকে পড়াই।
বিদ্যার অমূল্য মূল্য জগতে শিখাই॥

গুরুচাঁদের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হল বটে; কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। কারণ শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ ছিল না। কিছুদূরে পরিচিত জনের বাড়িতে রেখে গুরুচাঁদকে লেখাপড়া শেখাবার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল গুরুচাঁদের ১২ বছর বয়সেই তাতে ছেদ পড়ে যায়। গুরুচাঁদ মুসলমানদের মক্তবে পড়াশোনা করে আরবি-ফার্সি ভাষা শিখেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর না হলেও, গুরুচাঁদের শিক্ষার আগ্রহ কমেনি। এবং নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য তিনি নানাভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এখানে অন্য আরেকটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, তাহলো — হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদকে পাঠশালায় পাঠান শুধুমাত্র নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য নয়। শিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সমাজকে শেখাবার জন্য।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত পাঠ করে আমরা জানতে পারি—

বহু বহু পুস্তকাদি রঘুনাথ পড়ে।
সকল শোনেন প্রভু বসি কিছু দূরে॥
এইভাবে রঘুনাথ নিত্য আসে যায়।
যতেক সুন্দর গ্রন্থ প্রভুকে শোনায়॥
পরে যবে বড়বাবু শ্রী শশীভূষণ।
পাঠ শেষ করি গৃহে করে আগমন॥
প্রভু তারে কাছে ডাকি বলে ক্ষণে ক্ষণে।
সংবাদ পত্রিকা তুমি পড় মোর স্থানে॥
ইতিহাস পত্রিকাদি পড়িতেন শশী।
গুরুচাঁদ শুনিতেন একমনে বসি॥

...........................................................

'সদ্ভাব শতক' গ্রন্থ কবির রচনা।
মেঘনাদ বধ কাব্য করে আলোচনা॥

...........................................................

আধুনিক যুগে যত বড় বড় নেতা।
গুরুচাঁদ বলিতেন তাহাদের কথা॥

এসব আলোচনায় আমরা সত্যিকারের গুরুচাঁদকে খুঁজে পাই। যিনি ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সমসাময়িক সমস্ত ঘটনার খবরাখবর রাখেন ও বিচার বিশ্লেষণ করেন। এই আধুনিক ও শিক্ষিত গুরুচাঁদের সম্পর্কে যদি পাঠকদের স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পরামর্শকে সাধারণ ধর্মীয় গুরুদের মত বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন মন্তব্য বলে ভুল হতে পারে।

হরিচাঁদ ঠাকুর পরিকল্পিত অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বা পতিত উদ্ধারের কাজ গুরুচাঁদ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন কাজটি বড় কঠিন এবং জটিল। তার মত দৃঢ়চেতা মানুষও মাঝে মাঝে হতোদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়তে থাকেন। গুরুচাঁদ চরিতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

কিবা কই, কারে কই, কেবা বোঝে কথা।
এমন বিষম দায়ে ঠেকায়েছে পিতা॥
বোকা জাত, দিবা রাত, করে অপকর্ম।
জ্ঞান কাণ্ড কিছু নাই কিসে পাবে ধর্ম॥
আজ বুঝি কেন বাবা বলেছিল মোরে।
বড়ই ঠেকেছি আমি এসে এই ঘরে॥

কিন্তু গুরুচাঁদ দমে যাবার মাত্র নন। গুরুচাঁদের বুঝতে কোন আসুবিধা হয়নি যে, মতুয়াধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিদ্যাশিক্ষার প্রসার। জাতিকে জাগিয়ে তুলতে এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্যাশিক্ষাকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তিনি ঘোষণা করেন—

নম জাতি নাম ভাল নমস্য সবার।
নমস্কার পেতে লাগে কোন ব্যবহার?
ধর্ম আর বিদ্যা বলে চিত্ত শুদ্ধ হয়।
চিত্ত শুদ্ধ জনে সবে ভকতি জানায়॥

—কিন্তু সে সময়ে শিক্ষা আন্দোলনের কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, বরং অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন ছাড়া মানুষকে কোন কাজে উৎসাহিত করা যায় না। গুরুচাঁদের সময়কালে বাংলার পতিত মানুষের বাঁচবার উপায় ছিল কৃষিকাজ ও অন্যান্য কায়িক শ্রমের কাজকর্ম। তাতে শিক্ষার তেমন কোন প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া শিক্ষার মূল্য সম্পর্কেও তাদের মধ্যে কোন ধারণা ছিল না।

উপরন্তু ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার এক নতুন নীতি গ্রহণ করে। তারা সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করে যে, অস্পৃশ্য মানুষদের কোনরকম সরকারি চাকরি দেওয়া হবে না। উচ্চ বর্ণহিন্দুদের চাপে সরকার এই নীতি প্রণয়ন করে। বহুকষ্টে দু'একজন লেখাপড়া কিছুটা শিখেছিলেন—এমনকি ম্যাট্রিক পাশও করেছিলেন — সরকার তাদের কোন চাকরি দেয়নি। তারা বেকার থেকে যান। এসব দেখে ও জেনে, পতিত সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়।

এমন একজন নমঃশূদ্র সন্তান রঘুনাথ সরকারের নাম গুরুচাঁদ চরিতে জানা যায়। শিক্ষিত রঘুনাথ এমনকি বিনা পয়সায় স্বজাতির মানুষকে শিক্ষা দান করে বড় করে তুলতে চেয়েছেন। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন; কিন্তু তার অনুরোধে কেউ সাড়া দেননি। তিনি নিজেও কোন সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে নিতে পারেননি। রঘুনাথ পণ্ডিতের হতাশার সুর শুনতে পাওয়া যায় গুরুচাঁদ চরিতের পাতায়—

সবিনয় রঘুনাথ বলে তার ঠাঁই।
শিক্ষকতা কার্য লাগি ঘুরিয়া বেড়াই॥
নমঃশূদ্র কূলে জন্ম আমি লভিয়াছি।
বহুকষ্টে কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি॥
স্বজাতির ঘরে মোর বিদ্যা নাহি চিনে।
স্বজাতি বিদ্বান করি ভাবি মনে মনে॥
যেই যেই দেশে যাই স্বজাতি ভিতর।
বিদ্যা অবহেলা করে, বোঝে না আদর॥

পতিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা ছিল। কাছাকাছি কোন স্কুল ছিল না। ছিল শিক্ষকের অভাব। উচ্চ বর্ণহিন্দু শিক্ষক যারা ছিলেন, তারা পতিতদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ও আন্তরিক ছিলেন না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে গুরুচাঁদ নিজের উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজের বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সে স্কুল গ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

কিন্তু স্কুলটি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ শিক্ষকের অভাব। উচ্চবর্ণহিন্দু শিক্ষকেরা, বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের শিক্ষার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়ালের মত জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত বোঝে যে, কে তাকে ভালবাসেন, আদর-যত্ন করেন; আর কে তা করেন না। শিশুরা ছোট হলেও তারা বোঝে না, এমন নয়। শিক্ষকের ঘৃণা ও অবজ্ঞাসুলভ ব্যবহারে শিশুমনে আঘাত লাগতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তারা স্কুলে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। স্কুল ছাত্র শূন্য হয়ে যায়। এই সংকটের বর্ণনা পাই মতুয়া ধর্মগ্রন্থের পাতায়—

অন্য জাতি শিক্ষা দেয় শুধু অর্থ জন্য।
নমঃশূদ্রগণে করে মূর্খ মধ্যে গণ্য॥

নিরুপায় হয়ে তারা সবে মনক্ষুন্ন।
পাঠশালে দৃষ্টি নাহি করে কোনজন॥
দিনে দিনে পাঠশালা সবে দিল ছাড়ি।
সবে মিলি উপনীত ঠাকুরের বাড়ি॥

..................................................

স্বজাতি শিক্ষক যদি মিলে কোন দিনে।
তার হাতে শিক্ষা দিব আপন সন্তানে॥

পতিত মানুষের মধ্যে শিক্ষায় অনাগ্রহ, স্কুলের সমস্যা, শিক্ষকের অভাব – এসবতো ছিলই, তার থেকে বেশি বিরোধিতা ছিল উচ্চ বর্ণহিন্দুদের পক্ষ থেকে তারা একেবারেই চাইতেন না যে, পতিত মানুষেরা, বিশেষ করে নমঃশূদ্র বা চাঁড়াল লেখাপড়া শিখুন। তারা ভাবতেন চণ্ডালরা শিক্ষিত হওয়ার অর্থ উচ্চবর্ণীয়দের মর্যাদা আঘাত লাগা। তাছাড়া চণ্ডালরা শিক্ষিত হলে তা যে বর্ণহিন্দুদের অর্থনীতিতেও প্রভ ফেলবে, তা তারা বুঝতেন। কারণ শিক্ষিত মানুষকে সহজে ঠকানো যায় না বা অ অল্প মজুরিতে, এমনকি বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নেওয়া যায় না।

শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গুরুচাঁদ আবারও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমে তা উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। গুরুচাঁদের এই ঐকান্তিক প্রচে দেখে পাশের গ্রাম ঘৃতকান্দির উদারমনা ধনী ব্যবসায়ী উচ্চ বংশোদ্ভুত গিরীশচন্দ্র ব গুরুচাঁদকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। তিনি প্রস্তাব দেন —দাতব্য চিকিৎসাল ও স্কুল করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করবেন। যদিও উচ্চ বর্ণহি বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে তার পক্ষে প্রস্তাবিত সহযোগিতা করা সম্ভব হয় ন উচ্চ বর্ণহিন্দুদের হীন মানসিকতার জ্বলন্ত বিবরণ পাওয়া যায় গুরুচাঁদ চরিতে—

এই দেশে চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই।
দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিতে চাই॥
প্রভু বলে মহাশয় বড় ভাল কথা।
ব্যাধি দূর করা বটে অতি উদারতা॥
অজ্ঞান ব্যাধিতে ভরা আছে এই দেশ।
জ্ঞানের আলোকে ব্যাধি তুমি কর শেষ॥
উচ্চ বিদ্যালয় এই দেশে কোথা নাই।
উচ্চ বিদ্যালয় কর এই ভিক্ষা চাই॥

..................................................

তব আজ্ঞা শিরোধার্য আমি করিলাম।
করিব ইংরাজী স্কুল কথা যে দিলাম॥

কলকাতা শহরে বড় কাঠের ব্যবসা গিরীশচন্দ্র বসুর। তার এই প্রতিশ্রু

কথা উচ্চ বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষের কানে পৌঁছে যায় এবং তারা বিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা গিরীশচন্দ্র বসুকে ডেকে পাঠান এবং নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন—

হিংসুক ব্রাহ্মণ যত ভাবে মনে মন।
উচ্চ শিক্ষা পায় যদি নমঃশূদ্র গণ॥
কিছুতেই নিস্তার মোরা নাহি পাব আর।
নমঃশূদ্র করিবেক সব অধিকার॥

.........................................................

সে কেন করিবে স্কুল নমঃর ভিতরে।
শিক্ষা পেলে নমঃ আর নাহি মানে কারে॥

.........................................................

চিকিৎসালয় দিবে দাও নাহি করি মানা।
স্কুল দিবে কোন মর্মে কিছুতো বুঝি না॥

.........................................................

নমঃ জাতি চিন তুমি বিদ্যা শিক্ষা নাই।
বিদ্যাহীন বলে মোরা তাদেরে চরাই॥
স্কুল যদি পায় তারা বিদ্বান হইবে।
আমাদের মান বাপু কভু না রহিবে॥

শুধু যে এভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলন ভেস্তে দিতে উচ্চ বর্ণহিন্দুরা পতিতদের বিরোধিতা করলেন তাই নয়। কখনও কখনও মুসলমানদের সাথে চণ্ডালদের দাঙ্গায় প্ররোচিত করে, পরে পিটুনী পুলিশ বসিয়ে তাদের প্রগতির আন্দোলন স্তব্ধ করতেও ষড়যন্ত্র করেছেন। পতিতদের পতিত করে রাখতে এমন বহুবিধ পথ তারা অবলম্বন করে আসছেন সুদূর অতীতকাল থেকে। ইংরেজ সরকার যাতে পতিতদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ না নেয়, তার জন্য ইংরেজ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মন বিষিয়ে দিতে তারা সব সময় তৎপর ছিলেন। —এসব চক্রান্তের এক মর্মান্তিক বিবরণ পাই নীচের বাক্যগুলিতে—

প্রভুর নিকটে বসি মনোদুখে কয়;
বড় ব্যথা পাইয়াছি শুন মহাশয়॥
বড়ই জঘন্য কথা রিপোর্টেতে লেখা।
বিষম দায়ের হাতে পড়িয়াছি ঠেকা॥
নিজ মুখে উচ্চারণ করিতে না পারি।
আভাসেতে কিছু কিছু ব্যাখ্যা আমি করি॥
রীতি নীতি এ জাতির কিছু লেখা নাই।
দোষ লিখে সবখানে রেখেছে সাফাই॥

বিবাহদি, শ্রাদ্ধকর্ম, পূজাদি পার্বণ।
কিছুই উল্লেখ নাই হিংসার কারণ॥

হরি-গুরুচাঁদের জীবনের এমন অসংখ্য বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে মতুয়া ধর্ম গ্রন্থ দু'টিতে পতিত মানুষদের শত্রু, মিত্র, বিশেষ করে জাতশত্রুদের চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। নানা ঘটনা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় দেড়শ' বছরের ব্যবধানে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মানসিকতায় মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে হয় আজও মতুয়ারা শত্রু-মিত্র সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারেননি। নানা আলোচনায় যদিও বা তারা কিছু বোঝেন, উপলব্ধি প্রকাশ করেন; কার্যক্ষেত্রে তাদের তা মনে থাকে না। বাস্তবতঃ আজও তারা তাদের শত্রুর কাছেই আত্মসমর্পণ করে চলেছেন, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নেতৃত্ব বর্ণ হিন্দুদের হাতেই সমর্পণ করে চলেছেন, এবং এই সব শত্রুর প্ররোচনা ও চক্রান্তে ফেঁসে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন।

স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণহিন্দু — বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমাজের এই জঘন্য চক্রান্ত গুরুচাঁদের জিদ্ আরও বাড়িয়ে দেয়। গিরীশচন্দ্র বসুর পিছিয়ে যাবার ফলে তাঁর কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় এবং সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করেন।

গুরুচাঁদ উপলব্ধি করেন যে, আত্মশক্তিতে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্যকোন পথ খোলা নেই। তাই, পতিতদের চাগিয়ে তোলার জন্য, তাদের মধ্যে শিক্ষার জন্য আগ্রহের জোয়ার সৃষ্টির জন্য তিনি আন্দোলনের পথকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবলেন। সমবেত মানুষের অংশগ্রহণে ও প্রচেষ্টায়, ইচ্ছা এবং মুষ্ঠিদানের পাহাড় গড়ে যাতে মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে পারেন, সেই পথ স্থির করলেন। ডাক দিয়ে তিনি বললেন —

মোর পিতা হরিচাঁদ বলে গেছে মোরে।
বিদ্যাশিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে॥
বিদ্যা বিনা সব বৃথা দেখ মনে ভেবে।
বিদ্যা পেলে ধন মান সব কিছু পাবে॥
শুন স্বজাতি গণ সবে মনোকথা।
বিদ্যাশূন্য ধন মান সব জানো বৃথা॥
নমঃশূদ্র জাতি যদি বাঁচিবারে চাও।
যাক প্রাণ সেও ভাল বিদ্যা শিখে লও॥
আমি বলি বিদ্যাশূন্য রবে সেই জন।
নমঃশূদ্র বলি তারে বল না কখন॥
বিদ্যাবান সেই জন তাকে মান্য দাও।
বিদ্যার ভিত্তিতে সবে সমাজ গড়াও॥

যেই জন বিদ্যাবান পরম পণ্ডিত।
সমাজের পতি তারে মানিবে নিশ্চিত॥
বিদ্যা ছাড়া কথা নাই বিদ্যা কর সার।
বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, অন্যসব ছার॥
বাঁচ বা না বাঁচ প্রাণে, বিদ্যা শিক্ষা চাই।
বিদ্যাহীন হলে বড়, তার মূল্য নাই॥
বারে বারে বলি তাই স্বজাতির গণ
শেখ বিদ্যা, রাখ বিদ্যা, করে প্রাণপণ॥

..................................................

সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে॥
খাও বা না খাও তাতে কোন দুঃখ নাই।
ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই॥

..................................................

জনে জনে ভক্ত গণে প্রভু ডাকি কয়।
পাঠশালা করো সবে নিজ নিজ গাঁয়॥

গুরুচাঁদের এই উদাত্ত আহ্বান পতিত মানুষের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। তা তাঁদের অন্তরের উপলব্ধিতে কম্পন জাগায়। শত সহস্র বছরের ঘুমন্ত চেতনার আগ্নেয়গিরি বিদ্যার মহাকাশে ডানা মেলতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারা যেন বিদ্যুৎ স্পর্শের মত ঝট্‌কা খেয়ে জেগে ওঠেন ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য শপথ নেন—

এত যদি বলে প্রভু সভার ভিতরে।
জনে জনে সবে মিলি করে অঙ্গীকার॥
আজ হতে সবে মোরা অঙ্গীকার করি।
বিদ্যা ঘরে নিব তাতে বাঁচি কিংবা মরি॥
ঘরে ঘরে জনে জনে করে আলোচনা।
প্রাণ দিয়ে কর সবে বিদ্যার সাধনা॥

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা বিদ্যা শিক্ষা বা স্কুল কলেজের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও সমাজে বা গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বহুবিধ শিক্ষার বিষয়ও মতুয়াধর্ম অবহেলা করেনি; বরং যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তা মানুষকে বোঝানোর বা শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হয়েছে মতুয়াধর্ম।

আদর্শ পিতা-পুত্র সম্পর্ক বোঝাতে গুরুচাঁদ চরিতে উল্লেখ করা হয়েছে হরি গুরুচাঁদের পারস্পরিক ব্যবহার ও কথোপকথন —

পিতা যবে গৃহে আসে ভক্ত সংহতি।
আহারাদি সুব্যবস্থা করে শীঘ্র গতি॥
পিতার অগ্রেতে প্রায় কভু নাহি যায়।
দূরে রহি প্রীতি কার্য সকল করয়॥

আদর্শ শুশুড়ি-বৌমা সম্পর্ক কেমন হওয়া বাঞ্চনীয়, শান্তি দেবী ও সত্য ভামার আচরণ উল্লেখ করে তা বোঝানোর ও লোকশিক্ষা দেবার চেষ্টা হয়েছে—

কোন কর্ম করিবারে শান্তি দেবী ধায়।
হাত হতে সত্যভামা তাহা কাড়ি লয়॥
হাসিয়া বধূকে মাতা কত করে রোষ।
এইটুকু কাজ করা কিসে মোর দোষ?

— কথাগুলি আজ একান্ত সাধারণ কথা বলে মনে হতে পারে, কারণ এই দৃশ্য পতিত সমাজের ঘরে ঘরে নিত্য ঘটে চলে। জীবনের অঙ্গ হয়ে যাওয়া এই শিক্ষা সমাজে কবে এবং কিভাবে এলো তার খোঁজ ক'জন রাখেন?

পরিমিতি, ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার প্রয়োজন বোঝাতে হরি-গুরুচাঁদের শিক্ষা হল—

দেহমন নহে শূচি গৃহধর্ম করে।
ছিদ্র যুক্ত তরী সম ডুবে যে সাগরে॥
.........................................................
স্বল্প নিদ্রা জীবগণে সুখের কারণ।
অতি নিদ্রা জানিবেক মৃত্যুর লক্ষণ॥

পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিনয়, ভদ্রতা প্রভৃতির শিক্ষা দিতে মতুয়াদের মধ্যে প্রচলন করা হয় পারস্পরিক প্রণাম নিবেদন নিয়ম। যেখানে এমনকি ছোট বড় ভেদাভেদও মুছে দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের পারস্পরিক প্রণাম নিবেদনের ব্যতিক্রমী নিয়ম চালু আছে মতুয়াদের সমাজে। অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম যেখানে নারীদের বহুক্ষেত্রে ব্রাত্য করে রাখে, সেখানে মতুয়াধর্ম সবক্ষেত্রে নারীদের সমান সম্মান ও অধিকার দান করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। আধুনিক ভাবনার পরিচয় রেখেছে। —এই সুখবার্তার পাশাপাশি কিছু বিচ্যুতির লক্ষ্মণও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মতুয়া সমাজে। তাদের বুঝতে হবে—পরস্পর প্রণাম নিবেদন নিছক কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, এ হলো এক মহৎ শিক্ষা। পরস্পরকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। গণ্ডগোল, মনোমালিন্য, বিভেদ যেন মতুয়াদের মধ্যে কোনভাবেই বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য বর্তমান দুষণযুক্ত নোংরা প্রাকৃতিক পরিবেশে পদধূলি গ্রহণের পরিবর্তে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশের অন্য কোন

উপায় খোঁজ করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

হরি-গুরুচাঁদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পক্ষে ছিলেন এবং তার অনুগামী অনুসারিদের হিন্দু মুসলমান ও বর্ণ, উপবর্ণ ভেদাভেদের বিপক্ষে মিলন মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

আমার পিতার ভক্ত আছে যত জন।
এক জাতি বলে তারা হয়েছে গণন॥
লোকাচারে তারা কেহ কায়স্থ ব্রাহ্মণ।
মতুয়ার মধ্যে তাহা নাহি নিরূপণ॥
নমঃশূদ্র তেলী-মালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ।
ইসলাম বৈদ্য জাতি রোগে সিদ্ধহস্ত॥
মতুয়া সকলে এক, জাতিভেদ নাই।
বিশেষত কন্যা হলে নাহিক বালাই॥

গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজের সম্পর্কে বললেন—

সবাকে ডাকিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
শুন সবে ভক্তগণ আমি যাহা জানি॥
নমঃশূদ্র কুলে জন্ম হয়েছে আমার।
তবু বলি আমি নহি নমঃর একার॥

কিন্তু কথা আর কাজ নানা কারণে সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে না। ভালমন্দ মানুষ চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন। ফলে সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা এক গুরুতর সমস্যা। বহু পূর্বে তা গুরুতর আকার না নিলেও, কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে এই সমস্যা গোটা ভারতব্যাপী ভয়ংকর সমস্যা হিসাবে উঠে আসে ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার রূপ নিতে থাকে। বিশেষ করে উচ্চ বর্ণহিন্দুরা এই সমস্যাকে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখার কাজে ব্যবহার শুরু করেন ও সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলেন। — এসব নানা ধরণের সমস্যা কিছু মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করে নিতে চাইলেও কুচক্রীরা বহুক্ষেত্রে জয়ী হন—

কিন্তু দুষ্টগ্রহ শনি আসিয়া জুটিল;
মুসলমানেরা ডাকি কহিতে লাগিল॥
কাফেরের এত বৃদ্ধি দেখা নাহি যায়।
ধর অস্ত্র, কর রণ, হোক সব ক্ষয়॥
বিশ গুণে বেশি মোরা তাতে মুসলমান।
ক্ষুদ্র হিন্দু কিসে হবে মোদের সমান?

— এ বর্ণনা পদ্মবিলার কাজিয়ার সময়কার। দাঙ্গা নয়। কাজিয়ার অর্থ — দিনক্ষণ দিয়ে শক্তি পরীক্ষার লড়াই। পদ্মবিলার সমস্যা সামান্য সমস্যা। কিন্তু বার বার শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায়। সংখ্যালঘু নমঃশূদ্রদের উচিত শিক্ষা দিতে একশ্রেণীর মুসলমান গোঁ ছাড়তে রাজি হন না।

কোনখানে নমঃশূদ্র আগে দোষ করে।
কোনখানে ইসলাম আগে অস্ত্র ধরে॥
অস্ত্র খেলা দুজাতির আছে জানা ভাল।
সামান্য কারণে ঘটে বিষম জঞ্জাল॥

—পদ্মবিলার কাজিয়া শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না। গুরুচাঁদকে তাই পক্ষ নিতেই হলো। তিনি নমঃশূদ্রদের ডেকে বললেন—

শুন শুন নমঃশূদ্র আমার বচন।
যথা ধর্ম তথা জয় শাস্ত্রের লিখন॥
অধর্ম অন্যায় যুদ্ধ কেহ না করিও।
পরে ভিন্ন অগ্রে কোন অস্ত্র না ধরিও॥
আক্রমণ না করিলে কিছু নাহি কবে।
আক্রমণ করে যদি তবে যুদ্ধ দেবে॥

আত্মরক্ষার শ্বাশত ধর্ম ও নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেন তিনি। দাঙ্গা-কাজিয়া থেকে সবাইকে নিরস্ত করে শান্তি ও ঐক্যের কথা বলেন। কিন্তু শুভ ইচ্ছা অন্তত পদ্মবিলার কাজিয়ার সময়ে জয়যুক্ত হতে পারেনি—

প্রভু কয় শুন সবে নমঃশূদ্র গণ।
দাঙ্গা যুদ্ধ করা ভাল নহে কদাচন॥
অকারণে কারো সাথে না কর বিবাদ।
বিবাদে বাড়ায় দেখি শুধুই আপদ॥
আত্মরক্ষা কারণেতে পার যুদ্ধ দিতে।
কিন্তু কাজ কর নাহি অধর্মের পথে॥
বিশেষত এক কথা কহি সকলেরে।
হিন্দু মুসলমান আছি দেশ ভরে॥
এক ভাষা, এক আশা, এক ব্যবসাতে।
কেনবা করিবে রণ তাহাদের সাথে॥
দুই ভাই এক ঠাঁই রহ মিলে মিশে।
ভাই মেরে বল কেন, মর হিংসা বিষে॥

কিন্তু তবুও ঘটে। কেউ কথা শোনে, কেউ শোনে না। শক্তির বাহাদুরি দেখাতে

কিছু মানুষ তেতে ওঠেন। আবার ঘটে যায় গোপালপুরের ভয়ংকর কাজিয়া। আজকের দিনে নমঃশূদ্র ও মুসলমানের মধ্যে যে দূরত্ব, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, তার একটা বড় কারণ অতীতের এইসব কাজিয়া-দাঙ্গা। জমিদার-জমি মালিকরা লেঠেল হিসাবে তাদের ব্যবহার করতেন—যা বহু সময়ে দুই সম্প্রদায়ের মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হতো। সেই লড়াইয়ের রেশ যেন আজও তারা বয়ে চলেছেন!

সেই গ্রামে অত্যাচারি কিছু মুসলমান।
অকারণে নমঃশূদ্রে করে অপমান॥
যাক জান, থাক মান, করে অঙ্গীকার।
প্রতিকারে নমঃশূদ্র বদ্ধপরিকর॥

—কিছু মানুষ মারা যান। দুর্ধর্ষ নমঃশূদ্র লাঠিয়ালদের কলা-কৌশলের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পেরে ওঠেন না। তারাই মারা পড়েন। নমঃশূদ্রদের জব্দ করার জন্য এবং গুরুচাঁদের নেতৃত্বে তাদের প্রগতির আন্দোলন স্তব্ধ করার একটা ভাল সুযোগ এসে যায় বর্ণ হিন্দুদের সামনে। তারা মুসলমানদের পরামর্শ দেন নমঃশূদ্রদের দাঙ্গাপ্রবণ জাতি হিসাবে ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে নালিশ জানাতে। মুসলমানরা দরখাস্ত করেন এবং বর্ণহিন্দু সরকারি কর্মচারিরা, বিশেষ করে নবগোপাল চাকী মহাশয় (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) মুসলমানদের দাবির ন্যায্যতা লিখে দরখাস্ত কমিশনারের অফিসে পাঠিয়ে দেন।

নমঃশূদ্ররা লাঠি হাতে যতটা অপ্রতিরোধ্য ছিলেন; অন্যদিকে বেশি অসহায় ও ভীত ছিলেন আইন আদালত ও পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপারে। কারণ শিক্ষা নেই, অর্থ নেই। তাই, এ ক্ষেত্রে বাঁচার তাগিদে তারা আছড়ে পড়েন গুরুচাঁদের পায়ে। বিভাগীয় ইংরেজ কমিশনার অভিযোগের তদন্তে আসেন। শেষ পর্যন্ত গুরুচাঁদ এই বিপদ থেকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে শুধু রক্ষা করেননি। তথ্যানুসন্ধানের জন্য গ্রামে গেলে হাইস্কুল গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কমিশনারের কাছ থেকে তিনি আদায় করে নেন। গুরুচাঁদ চরিতে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবে তিনি গোপালপুরের গোয়ারগুলোকে ছেড়ে কথা বলেননি। খুনোখুনি করার জন্য তীব্র ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন, সাবধান করেন এবং জরিমানা হিসাবে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা ধার্য করেন। এসব ঘটনার বর্ণনা গুরুচাঁদ চরিতের ভাষায়—

তোমাদের ব্যবহার সব আমি জানি।
কাঁদা কাটি যাহা কর কিছু নাহি মানি॥
কিবা কাজ হবে তোরা বাঁচিয়া থাকিলে।
কিবা কাজ করেছিস তোরা এতকালে॥
শয়ন, ভোজন আর পুত্র কন্যা জন্ম।
তোদের জীবনে দেখি শুধু এই ধর্ম॥
না মানিলি গুরু বিষ্ণু না হলি বিদ্বান।

তোদের জীবনে দেখি কেন এত টান॥
ইতর পশুরা আছে বেঁচে যেই ভাবে।
তোরাও তাদের মত কাজে কি স্বভাবে॥
এমন জীবনে বল বেঁচে কিবা ফল।
আকারে মানুষ বটে পশু এক দল॥

.....................................................

ওরা যদি মুক্তি চায় যা বলি করুক।
কতটাকা স্কুলে দেবে আমাকে বলুক॥
ওড়াকান্দি হাইস্কুল করিবারে চাই।
ওরা কত চাঁদা দেবে বলুক সবাই॥

শুধু কথা নয়, কাজ করতে বলেন হরি-গুরুচাঁদ। সমাজ উন্নয়ন ও ঐক্যচেতনা গড়ার উপদেশ দেয় মতুয়া ধর্ম—

পতিত পাবন লাগি এলো মোর পিতা।
তার কার্য সাধিবারে করগো একতা॥
শুধু গুণগান নহে ধরমের সার।
তৎপ্রীতি কাম হেতু কর্ম কর তার॥
পতিত পাবন পদে যদি থাকে ভক্তি।
প্রাণ দিয়ে কর সবে পতিতের মুক্তি॥

.....................................................

জাতির মঙ্গল তরে কোন কাজ হলে।
ম'তোরা করিতে পারে স্বার্থ চিন্তা ফেলে॥

মতুয়াধর্ম, নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও নারীর সমমর্যাদায় বিশ্বাস করে। অজ পাড়াগাঁয়ে গুরুচাঁদ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারী-পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালবাসার শিক্ষা প্রচলন করেছিলেন। সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী, তাই, তাদের বাদ দিয়ে সমাজ, জাতি ও দেশ যে এগোতে পারে না — মতুয়াধর্ম প্রবর্তকেরা তা উপলব্ধি করেছিলেন। মহান শিক্ষক ও রাষ্ট্রনেতা মাও সেতুং বলেছিলেন 'পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ হলো নারী' — মাও সেতুং-এর এই আহ্বানের অনেক আগে থেকেই মতুয়ারা এই নীতির নিবিড় অনুশীলনে রত আছেন—

আর কথা বলি যাহা শোন মন দিয়া।
নর নারী বিদ্যা শিক্ষা কর এক হৈয়া॥
মাতা ভাল নাহি হলে পুত্র ভাল নয়।
মার গুণে ছা ভাল লোকে তাই কয়॥

সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই উপলব্ধি থেকে (ব্রাহ্মণ) নারী শিক্ষার প্রচলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— যার ২০টি বিদ্যালয় করেছিলেন ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত হুগলী জেলাতেই। গোটা বাংলার বৃহত্তর অংশ হলো পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের কোন জেলাতেই, বিশেষ করে দুই বাংলার কোন গ্রামাঞ্চলেই বিদ্যাসাগর একটিও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেননি বা স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তাঁর স্কুলগুলিতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছাত্রীদের ভর্তির নিয়ম ছিল; অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিলেন ব্রাত্য। গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সমসাময়িককালের মানুষ। বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুচাঁদ ঠাকুরের থেকে সামান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ। গুরুচাঁদ এবং তার অনুগামীরা বহু পাঠশালা তৈরি করেছিলেন। শিক্ষা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ সব মানুষেরা ছিলেন স্বাগত। সে জন্য দেওয়ালে যখন লেখা হয় — 'বিদ্যাসাগরের দেশ, নিরক্ষরতার করবো শেষ' — তখন বামপন্থা ও বামপন্থি সরকারের জন্য করুণা হয়। ধিক্কার জানাতে ইচ্ছা হয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও, ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর বার বার পদার্পণ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের নিজ গ্রামের ৩০ শতাংশ মানুষকে আজও স্বাক্ষর করে তোলা যায়নি। সে গ্রামের নিম্নবর্ণ মানুষেরা আজও অক্ষর জ্ঞানহীন। কিন্তু ওড়াকান্দি ও এমন হাজার গ্রাম? —সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম সমাজ! তাই 'আসল' চেপে রেখে যতই 'আধা আসল'কে আসল বলে চালানোর চেষ্টা হোক না কেন, এ চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে সত্য একদিন সূর্যের মত মহাকাশে জ্বল জ্বল করবেই। সেদিন আর বেশিদূরে নেই, দেওয়ালে লেখা হবে — 'গুরুচাঁদের দেশ, নিরক্ষরতার করবো শেষ।'

মতুয়াধর্ম প্রবর্তকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পতিত মানুষের পতিত হয়ে থাকার অন্যতম আরেক কারণ হলো তাদের আর্থিক দুরবস্থা। অর্থ না থাকা এবং অর্থ উপার্জনের পথ জানা না থাকায় তারা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না। তাই, মতুয়াধর্ম পতিত মানুষদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ আয়ত্ত্ব করার কলাকৌশল শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হয়। মতুয়া ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করা হয় এভাবে—

> গৃহস্থের মূল ভিত্তি অর্থনীতি বটে।
> 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' এই বাণী রটে॥
> বাণিজ্য করিয়া হরি শিখায় সকলে।
> গৃহী কত বড় হয় ব্যবসায়ী হলে॥

ব্যবসা বাণিজ্য বললেই মানুষ সোৎসাহে এগিয়ে এলেন, এমনটা ঘটেনি। পুঁজির সমস্যা ইত্যাদি ছিল ঠিকই; কিন্তু মুল প্রতিবন্ধকতা ছিল অন্যত্র। প্রচলিত ধর্মের নামে মানুষকে শেখানো হয়—জগত অসার। এ জন্মে দুঃখ কষ্ট এক অস্থায়ী ব্যাপার। মেনে নিতে হয়, তাহলে পরপারের সুখের সন্ধান সহজ হয়। টাকা কড়ি, বিলাস-বসন— এসব মোহ। মোহ, মুক্তির পরিপন্থি। এই মোহে আবদ্ধ না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি।

ধর্মের এই চিরাচরিত শিক্ষার বিপরীতে মতুয়াধর্ম শিক্ষা দেয়—

অর্থশূন্য বাক্য যথা প্রলাপ বচন।
অর্থশূন্য গৃহীজনে জানিবে তেমন॥
মহা শক্তি এই অর্থ, সবে যাকে চায়।
গৃহীর অর্থতে দেখ জগৎ বাঁচায়।
'অর্থ অনর্থের মূল' কহে যেই ভণ্ড॥
অর্থের জানে না অর্থ সেই অপগণ্ড।
অর্থ দেয় অন্নজল, অর্থ রাখে প্রাণ।
অর্থের সংহতি রহে জীবের কল্যাণ॥

গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য করে উন্নতি করেন। প্রয়োজনীয় টাকা-কড়ি উপার্জন করে পতিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করেন এবং পুঁজি দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে সহযোগিতা করেন। পতিত সমাজ, বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের কাছে এ ছিল এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন; এভাবে জীবনের প্রতিটি বাঁক-মোড় ও সমস্যায় মতুয়াধর্ম পতিত মানুষকে পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হরিচাঁদ প্রবর্তিত মতুয়াধর্মের নির্দেশ শিরোধার্য করে গুরুচাঁদ ঠাকুর স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। এবং ধর্মক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভাবনার প্রবর্তন করেন। গুরুচাঁদের শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে মতুয়ারা যার পর নাই উৎসাহিত হয়ে গ্রামে-গঞ্জে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জোয়ার সৃষ্টি করেন। ডাঃ অতুলচন্দ্র প্রধানের গবেষণা থেকে জানা যায় — গুরুচাঁদের আন্দোলনের ফলে, মতুয়াদের উদ্যোগে ১৯৩১ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গে বহু পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মতুয়ারা গৃহস্থের বসার বাইরের ঘরে, লম্বা-বড় বারান্দায়, গরু রাখার গোয়ালঘরে, গাছের ছায়ায় ক্লাস করার ব্যবস্থা করেন এবং ধীরে ধীরে আলাদা ও স্থায়ী স্কুলবাড়ি তৈরি করেন। শিক্ষকের সমস্যা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত ও সাধ্যমত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। গুরুচাঁদের আন্দোলনের প্রভাবে গোটা বাংলায় মতুয়া ও অন্যান্য পতিত মানুষেরা মিলে যে অসংখ্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নানা কারণে তা খুব বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারেনি।

বলা যায় পাঠশালা প্রতিষ্ঠার এক ঝড় বয়ে যায় গ্রামবাংলার কোণে কোণে। এভাবে প্রাথমিক কাজ অতি সাফল্যের সাথে শেষ হলেও, তখনও কাজ অনেক বাকি ছিল এবং বাকি কাজ ছিল কঠিনতর।

প্রথমাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে হাজার বছরের অনীহা ভেঙে যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ তৈরি হয়, সময়ের সাথে ধীরে ধীরে তা মিইয়ে যেতে থাকে। কারণ শিক্ষা গ্রহণের পর কাজ বা চাকরির কোন সুযোগ ছিল না। সরকারি চাকরি ছিল অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ। গুরুচাঁদ উপলব্ধি করেন যে, লেখাপড়ায় আগ্রহ

আনতে হলে পতিতদের জন্য সরকারি চাকরির দরজা খোলা দরকার—

এইসব ছেলে যদি চাকুরি না পায়।
লেখাপড়া কেহ নাহি করিবে হেথায়।।

ড. মীডের সহযোগিতায় এ ব্যাপারে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন, ডেপুটেশন-এর কাজ চালিয়ে যান। পতিতদের বিরুদ্ধে সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ ও সংঘবদ্ধ করেন। তাছাড়া এই সময়ে সরকারের বঙ্গভঙ্গ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার জন্য ইংরেজ সরকার গুরুচাঁদের দাবির প্রতি নজর দেয় এবং ১৯০৭ সালে বাংলার ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে অস্পৃশ্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা সরকার তুলে নেয়। ফলে, অচিরেই শশীভূষণ ঠাকুর (সাব-রেজিস্ট্রার), মোহনলাল বিশ্বাস (দারোগা), রাধানাথ মণ্ডল ও সিদ্ধেশ্বর হালদার (কানুনগো), ডাঃ তারিণী বল (সরকারি ডাক্তার) এবং কুমুদবিহারী মল্লিক (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) চাকরি পান। চাকরি পাবার ঘটনায় পতিত মানুষদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বেড়ে যায়। মানুষ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত ও আগ্রহী হন। সমাজে এক নবজাগরণের জোয়ার আসে। ড. মীড ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্য শুধুমাত্র বাংলাতে অস্পৃশ্য মানুষের চাকরি পাবার ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে ঐ নিষেধাজ্ঞা আগের মতই জারি থেকে যায়। তাই, ড. আম্বেদকরকে দেখা যায় যে, উনি ১৯২৭ সালে বম্বের অস্পৃশ্যদের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের প্রণীত ঐ কালানীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন।

গ্রামে-গঞ্জে ছোট ছোট পাঠশালা গড়ে উঠলো বটে; কিন্তু তা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মুষ্ঠিভিক্ষা ও নানা অনুষ্ঠানের খরচ থেকে বিদ্যাখাতে দান— টাকা আদায়ের এরূপ নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেও স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। অনেক পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়। গুরুচাঁদ বুঝতে পারেন সরকারি সাহায্য ও হস্তক্ষেপ ছাড়া স্কুল বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, শিক্ষা আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে!

কিন্তু প্রশাসনে কোন লোক নেই। রাজনীতিতে কোন প্রভাব নেই। গুরুচাঁদ চোখে অন্ধকার দেখেন। সমস্যা থেকে মুক্তির পথ খোঁজ করেন—

দেশের শাসনযন্ত্র যে যে ভাবে চলে।
কিছু নাহি বোঝা যায় চাকুরি না পেলে॥
তাতে বলি রাজকার্যে ভাগি থাকা চাই।
সকলে চাকুরি লবে তাহা বলি নাই॥
শক্তি না দেখিলে কেহ করে না সম্মান।
শক্তিশালী হতে সবে হও যত্নবান॥

গুরুচাঁদ ঠাকুর পতিত মানুষকে দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মত

ক্ষমতাধর করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনুগামীদের ডাক দিয়ে বললেন—

ধর্মের পালক রাজা জানিবে নিশ্চয়।
রাজ শক্তি বিনা কভু বড় নাহি হয়॥
জাতি ধর্ম যাহা কিছু উঠাইতে চাও।
রাজশক্তি থাকে যদি যাহা চাও পাও॥
রাজার করুণ দৃষ্টি এই জাতি পরে।
কোনক্রমে বাপু যদি পার আনিবারে॥
তবেত জাগিবে জাতি নাহিক সংশয়।
রাজশক্তি মূল শক্তি কহিনু নিশ্চয়॥

—এই একই কথা আরও অনেক পরে অন্য এক মহামণীষী ড. আম্বেদকর বলেছেন, — 'Capture the temple of political power...' অর্থাৎ 'রাজনৈতিক ক্ষমতার মন্দির দখল করো। রাজশক্তি হলো মূল চাবিকাঠি — যা দিয়ে সমস্ত সমস্যার দরজা খোলা যায়।' কিন্তু মতুয়াদের বুঝতে হবে রাজক্ষমতা করায়ত্ত করতে হলে মতুয়াদের নিজস্ব অথবা নিয়ন্ত্রানাধীন রাজনৈতিক পার্টি থাকতে হবে। **'যে জাতির দল নেই, সে জাতির বল নেই।'** এবং শুধু দল গড়লেই হবে না, সে দলের নেতৃত্ব দিতে হবে যোগ্যতম ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে — **'যেইজন বিদ্যাবান পরম পণ্ডিত, সমাজের পতি তারে মানিবে নিশ্চিত।'**

এ সময় ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশের অধীনে ভারতে নিজস্ব আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে আইন সভা দেশের আইন ও দেশ পরিচালনার নীতিমালা তৈরি করবে। পতিত মানুষের তখন এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যে, তারা আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করবেন। পতিতরা তখনও মোটেই প্রস্তুত নন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর গুরুচাঁদ তার একান্ত অনুগামী ও বিজ্ঞজন— এ্যাডভোকেট ভীষ্মদেব দাসকে আইন সভার সদস্য মনোনীত করার জন্য মনস্থির করেন। লীলামৃত ও গুরুচাঁদ চরিতের পাঠক এবং মতুয়াদের ভীষ্মদেব দাস সম্পর্কে নিশ্চয় জানা আছে। ভীষ্মদেব দাস ১৯১৯ সালে বাংলার আইন সভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি হলেন বাংলার আইনসভার প্রথম পতিত সদস্য। বাগেরহাটের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সুযোগ্য সন্তান নীরোদবিহারী মল্লিককেও ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য গুরুচাঁদ মতুয়াদের নির্দেশ দেন। মল্লিক মহাশয়ও নির্বাচনে বিজয়ী হন—

আদি নমঃ সভাসদ ব্যবস্থা সভার মাঝ
ভীষ্মদেব এল মনোনীতে।

..........................................................

ভীষ্মদেব দাস আর নিরোদ বিহারী।
কাউন্সিলের সভ্য হলো বহু চেষ্টা করি॥

দেশের আইন-কানুন প্রবর্তনের আগে ইংরেজ সরকার দু'টি কমিশন বা কমিটি গঠন করে। ১৯১৭ সালে ভারতে আসেন মন্টেগু এবং ১৯১৯ সালে সাউথ বরো কমিটি। — যারা দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সাথে কথা বলে তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা, সুবিধা অসুবিধা তথা তাদের দাবি দাওয়া জানতে চান — যাতে ভবিষ্যতে ভারতে যে আইন তৈরি হবে, তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ও সবার সমর্থন লাভ করে।

গুরুচাঁদ এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি পতিতদের তরফ থেকে একটা দাবিসনদ বা স্মারকলিপি মন্টেগের কাছে পেশ করার ব্যবস্থা করেন, যাতে বাংলার পতিত মানুষদের দুরবস্থা ও তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা সরকার জানতে পারে। সম্ভবতঃ এই স্মারকলিপিতে ভীষ্মদেব দাস স্বাক্ষর করেছিলেন, যার ফলে বিধান পরিষদে তার মনোনয়ন সহজ হয়ে যায়।

শুধু এই স্মারকলিপি নয়, গুরুচাঁদ বিভিন্ন সময়ে লাটসাহেবের কাছে নানা দাবি নিয়ে দেখা করেছেন, লর্ড লিটনের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবি পেশ করেছেন, এমন বহুবিধ কাজ করেছেন যা সমসাময়িককালে রাজনৈতিক নেতারা করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অন্যরা ততটা করে উঠতে পারেননি — যা পেরেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। এসব কাজে তাঁকে আমরা রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় দেখতে পাই। ড. মীড গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনকালে এদেশে দু'টি খুব বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা বা আন্দোলনের ইতিহাস দেখা যায়। একটি ১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং এই সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন, পাল্টা আন্দোলন। দ্বিতীয়টি ১৯০৬ সালে কংগ্রেস ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলন। দুটি আন্দোলনেই গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং তার অনুগামীদের সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে গুরুচাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা শুধুমাত্র এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা কিন্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাংলার প্রধানতম কৃষক নেতা। ভূমি সংস্কারের দাবি এবং তেভাগার দাবি গুরুচাঁদের পরিকল্পনার ফসল। কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবি তোলার অন্ততঃ ৪০ বছর আগে গুরুচাঁদের অনুগামীরা বিভিন্ন জেলায় তেভাগার দাবিতে আন্দোলন করেছেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে তার পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত দাবিসনদই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি ছিনতাই করে নিজেদের দাবিসনদ বলে চালায়। কৃষক নেতা হিসাবে তার নাম গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। যার জন্য তাকে এমনকি মেদিনীপুরের কাঁথিতে অনুষ্ঠিত সারা বাংলার কৃষকদের সমাবেশ ও সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে নির্বাচিত করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

অনেক মানুষ আছেন যারা গুরুচাঁদকে শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা হিসাবে মনে করেন। উপরে আলোচিত বিভিন্ন ঘটনা তাদের কাছে বেমানান বা বিসদৃশ মনে হতে পারে। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত আলোচিত ঘটনাসমূহ ঐতিহাসিক ঘটনা। সত্য ঘটনা। গুরুচাঁদ

ঠাকুর একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। রাম বা কৃষ্ণের ন্যায় কোন কাল্পনিক চরিত্র নন। মতুয়াধর্ম গার্হস্থ্য ধর্ম—অন্য ধর্মগুলির বিপরীত ধর্ম। তাই, মতুয়াদের ভগবান বা নেতা গৃহস্থের জীবন-জীবিকার নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করবেন এটাইতো স্বাভাবিক। বরং, তা না করাটাই অস্বাভাবিক!

পূর্ববঙ্গে পতিতশ্রেণীর মানুষ ও মুসলমানরাই সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ। পতিত মুসলমানরা ছিলেন অধিকাংশ কৃষক, প্রজা কৃষক। জমিদারদের প্রজা। অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন উচ্চ বর্ণহিন্দুরা।

১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকারের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জমির খাজনা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে যে পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে জমিদাররা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নেন, তা আর পরিবর্তনের বা বৃদ্ধি করার কোন আইনী সুযোগ ইংরেজ সরকারের ছিল না। সেজন্য ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলার জমিদাররা ইংরেজ সরকারকে অনেক কম টাকা দিয়ে জমি ভোগ দখল করে আসছিল। তাতে ইংরেজ সরকারের বিপুল অংকের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছিল।

তবে জমিদাররা ১১২ বছর ধরে একই পরিমান টাকা ইংরেজ সরকারকে দিলেও, জমিদাররা কিন্তু তাদের প্রজা কৃষকদের উপর খাজনার বোঝা দিনের পর দিন এত বেশি চাপিয়ে যাচ্ছিলেন যে, পতিত ও মুসলমান প্রজা কৃষকদের পক্ষে জমিদারের চাপানো বিপুল অংকের খাজনা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৮৮০ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে—জমিদাররা প্রজা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ২ কোটি পাউন্ড; আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী জমিদাররা ইংরেজ সরকারকে খাজনা দেন মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

ইংরেজ সরকার এই রাজস্ব ক্ষতি আটকাতে এবং বিশাল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায় অসুবিধা দূর করতে বা আরও অন্য কোন কারণে বঙ্গ প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। মনে রাখতে হবে—ঐ সময়ে বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে ছিল ঐক্যবদ্ধ আসাম (এখন যা সাতটি প্রদেশে বিভক্ত), ত্রিপুরা, বিহার ও উড়িষ্যা। জল-জঙ্গল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় শাসনকার্য পরিচালনায় ইংরেজদের অসুবিধার কথা শুধুই অজুহাত বলা যায় না। বঙ্গপ্রদেশ ভাগ করে ইংরেজরা দু'টি প্রদেশ গঠন করে। নতুন প্রদেশের নাম করা হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' এবং ঢাকাকে এই প্রদেশের রাজধানী করা হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই নতুন প্রদেশ কার্যকরি থাকে।

পূর্ববঙ্গের জমিদাররা ছিলেন প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের জমিদারি পূর্ববঙ্গে হলেও তারা কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোথাও বা ঢাকাতে বসবাস করতেন না। তারা থাকতেন কলকাতায়। তাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের জমিদারির আয়ে কলকাতায় বিলাসবহুল ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম মিলে নতুন প্রদেশ হওয়ায় এইসব জমিদাররা ভয় পেলেন। তাদের জমিদারি রক্ষা ও বিপুল আয়ের সংস্থান নিয়ে চিন্তায়

পড়লেন। বিশেষ করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' — একটি নতুন প্রদেশ হওয়ায়, তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার বাইরে গিয়ে আর্থিক ক্ষতির আশংকা করলেন জমিদারগণ এবং বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই, বঙ্গমায়ের শব ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি যে শ্লোগান তারা তুলেছিলেন, তা নিছক অজুহাত ও কথার কথা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। শোভাযাত্রা করেছিলেন, রাখীবন্ধন করেছিলেন, দেশাত্মবোধক গান রচনা ইত্যাদি করেছিলেন। কিন্তু এসব কতটা বাংলা মায়ের ঐক্যের জন্য; আর কতটুকু পূর্ববঙ্গের জমিদারি রক্ষার জন্য ও জমিদারি আয়ের স্বার্থে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তা যদি না হতো, তাহলে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে ১৯৪৭ সালে তারা বাংলাভাগের দাবি কেন তুললেন!

গুরুচাঁদ ঠাকুর নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়ি থেকে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। দায়িত্বে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষিত শশীভূষণ ঠাকুরের সাথে নিত্য আলোচনা করে গুরুচাঁদ দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত ও খবরাখবর রাখতেন। ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়ী তখন আধুনিক রাজনীতি ও দেশের নানা বাঁক মোড়ের বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতো, চর্চা হতো। ডাঃ মীড সাহেবও এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ ১৯০৫-০৭ সালে পতিত মানুষের রাজনৈতিক সদর দপ্তর ওড়াকান্দি—যার প্রধান সেনাপতি গুরুচাঁদ ঠাকুর।

১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তখন গুরুচাঁদ তার ফলাফল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। তিনি মনে করেন— সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে পুর্ববঙ্গের প্রজা কৃষকদের সুবিধা হবে। তিনি তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন — এই সিদ্ধান্তের ফলে জমিদারদের মুঠি অনেকটা আল্‌গা হতে বাধ্য এবং তাতে প্রজা কৃষকরা জমিদারদের শোষণ এবং অত্যাচার থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার পাবেন। বর্ণহিন্দুদের কব্জা কিছুটা শিথিল হবে, তাতে পতিতদের সুবিধা। তাছাড়া ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাড়া দিয়ে তিনি দরকষাকষি করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পতিতদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিও আদায় করে নেবার কৌশল অবলম্বন করেন। বাস্তবতঃ ১৯০৭ সালে পতিতদের সরকারি চাকরি পাবার পিছনে গুরুচাঁদের এই সিদ্ধান্ত কাজ দেয়।

পতিত সম্প্রদায় ও মুসলমান উভয়ে প্রজা কৃষক। তাই, তাদের স্বার্থও অনেকাংশে এক। সেজন্য মুসলমান নেতা নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের সাথে গুরুচাঁদ ঠাকুর যোগাযোগ করেন। আলোচনার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজ পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে ঢাকায় নবাবের কাছে পাঠান। উভয়ে একমত হন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলন সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেন। নমঃশূদ্র ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনের বিরোধিতা কর েন।

১৯০৬ সালে কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু করে। গুরুচাঁদ অসহযোগ আন্দোলনকে ভুল এবং বড়লোক

ব্যবসায়িদের স্বার্থের আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেন এবং পতিত-মুসলমান একযোগে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতে লেখা হয়েছে—

সেই পরামর্শ লাগি তাঁর কাছে যাই।
তাঁর গৃহে তব পুত্রে আমি দেখা পাই॥
একসঙ্গে পরামর্শ করিনু আমরা।
মোরা নাহি মানি লব আন্দোলন ধারা॥

(মন্ত্রী নবাব আলী, সলিমুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে যান এবং সেখানেই শশীভূষণ ঠাকুরের সাথে তার আলোচনা হয়)।

পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যাধিক মুসলমান এবং পতিত মানুষেরা, বিশেষ করে নমঃশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করায় আন্দোলন কোনভাবেই দানা বাঁধে না। বর্ণহিন্দুরা আন্দোলনের নামে গুণ্ডামি-বদমায়েশি শুরু করেন। সেজন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিঠি লেখেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে, তার জবাবে গুরুচাঁদ যা লিখে জানান — তাতে সমাজ ও দেশের ভবিষ্যত কাজের দিক্ নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়। ঠিক আজকের দিনেও মতুয়াদের রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুচাঁদের ঐ চিঠি এক অমূল্য দলিল হিসাবে পথ দেখায়—

অনুন্নত বলি যত আছে বঙ্গদেশে।
কোনভাবে দিন কাটে বেহালের বেশে॥
বিলাসিতা বলি তারা কিছু নাহি জানে।
কোনক্রমে কায়ক্লেশে বাঁচিছে পরাণে॥
বিদ্যাশিক্ষা বেশি কিছু তারা শিখে নাই।
রাজকার্যে অধিকার তাতে নাহি পাই॥
রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কভু নাহি ছোটে।
স্বাধীনতা কি পদার্থ বোঝে নাক মোটে॥
রাজনীতির সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই।
অসহযোগের প্রশ্ন তার কিবা ভাই॥
সত্যকথা দেশবন্ধু করি নিবেদন।
এই পথে স্বাধীনতা আসে না কখন॥
সমাজের অঙ্গে আছে যত দূর্বলতা।
আগে তাহা দূর করা আবশ্যক কথা॥
এই যে দলিত জাতি যত বঙ্গ দেশে।
ইহাদের দুঃখ কেহ দেখে নাকি এসে॥
কিবা খায়, কোথা পায়, কোন কার্য করে।
সন্ধান রাখে না কেহ কোন দিন তরে॥

দিনে দিনে এরা সবে হয়েছে হতাশ।
উচ্চবর্ণ হিন্দু গণে করে না বিশ্বাস॥

.......................................................

যদি উচ্চবর্ণ আজি তাহাদের চায়।
সেই পথে আছে মাত্র একটি উপায়॥
সরল উদারভাবে ভাই বলি বুকে।
টানিতে হইবে মনে, নহে মুখে মুখে॥
সম্পদে বিপদে সুখ সমভাবে বাঁটি।
ভাই হয়ে, ভাই বলে দিতে হবে খাঁটি॥

.......................................................

এক ভাই কর্মচারী অপরে উকিল।
ব্যবসায়ী অন্যজনে মূলে রাখে মিল॥
উকিল ছেড়েছে কর্ম স্বদেশী সাজিয়া।
কর্মচারী ভাই আছে আসনে বসিয়া॥
ব্যবসায়ি ভাই রহে দোকান পাতিয়া।
বহু লাভ করে তিনি খদ্দর বেঁচিয়া॥

.......................................................

দলিত পীড়িত যত পিছে পড়ে আছে।
শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে যান তাহাদের কাছে॥
প্রকৃত দরদ যদি জেগে থাকে মনে।
কুলেতে উঠান সবে হাত ধরে টেনে॥
অস্পৃশ্যতা মহাপাপ করুন রটনা।
প্রকৃত দরদ দিয়ে জাগান চেতনা॥

বলাই বাহুল্য যে, গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই আবেদন, নির্দেশ বা উপদেশ শুধু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে নয়; গোটা উচ্চবর্ণ সমাজের জন্য। কিন্তু ঐ সমাজের অন্যান্যদের সাথে এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনো শিক্ষা নিয়েছিলেন কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার। সমসাময়িক কালের মানুষ গুরুচাঁদ এবং রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কলমে গুরুচাঁদকে খুঁজে পাওয়া যায় না!

১৯০৫ সালে কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল। দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের সুনাম, সম্মান ও গুরুত্ব তখন আকাশছোঁয়া। সেই পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব কিছু সময়ের ব্যবধানে দুটি পৃথক চিঠি দিয়ে গুরুচাঁদকে অনুনয় বিনয় করে সহযোগিতা চাইছেন। কিন্তু গুরুচাঁদ তাতেও নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ভোলেননি। পতিত সমাজের উন্নয়নের নিরিখে তিনি সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনুরোধ প্রত্যাখান করেছেন। নেতাগণের অনুরোধ শুধু প্রত্যাখ্যান করেছেন তাই নয়, দেশ মানে যে শুধু

মাটি নয়, বরং দেশের জনগণ এবং তাদের উন্নয়নই হল মূলকথা — তা নেতাগণকে বলতে দ্বিধা করেননি। অস্পৃশ্যতা বিমোচন এবং গরিব পতিতদের উন্নয়ন ছাড়া যে দেশের উন্নতি হয় না—সে কথা বলতে ভোলেননি। স্বাধীনতার স্বাদ দেশের সব অংশের মানুষ না পেলে সে স্বাধীনতা যে প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, তা তিনি নেতাগণকে বুঝিয়ে দেন। পরিতাপের বিষয় এই যে মতুয়ারা বুঝতে চান না যে, গুরুচাঁদের চিঠি থেকে শুধু কংগ্রেসী নেতাদের শিক্ষা গ্রহণের কথা নয়; মূলত মতুয়াদের শিক্ষার জন্যই এসব ঐতিহাসিক তথ্য শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে, তা মতুয়া ধর্মান্দোলনের আদর্শ, পথসংকেত!

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সম্মেলন বা খুলনা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। মতুয়াদের অবশ্য জানা প্রয়োজন যে, ঐ সম্মেলন নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক সম্মেলন এবং তার সভাপতি স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর। ত্রিপুরাসহ পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলার বিশিষ্ট পতিত নেতৃবর্গ ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে গুরুচাঁদ ঠাকুর জাতির উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন—যা পতিত সমাজের রাজনীতির ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শন—

এই সম্মেলন হতে　　নমঃশূদ্র কোন পথে
চালনা করিবে রাজনীতি।
যাহা বলে দয়াময়　　সভা মধ্যে পাঠ হয়
তাতে সব জানালো স্বীকৃতি।

..................................

স্বাধীনতা যদি আসে　　তা হতে কি শ্রেষ্ঠ আছে
বুঝিনা যে এত অন্ধ নই।
স্বাধীনতা কথা ভাল　　নেয়া ভাল, দেয়া ভাল
ভাল তাতে নাহিক সন্দেহ।
কথামালা যাহা বলে　　পড়িয়াছ বাল্যকালে
সেই কথা ভুলিওনা কেহ।
বাঘের গলার হাঁড়　　টেনে যদি কর বার
পুরস্কার এক মুঠো ছাই।
যতসব মহাভাগ　　করিতেছে আত্মত্যাগ
তোমাদের জন্য কিছু নাই।
শুন বলি সে প্রমাণ　　যতসব মতিমান
আত্মত্যাগ করিছে ভারত।
স্বাধীনতা পাবে যবে　　কারা উপকৃত হবে
সেই কথা পার কি বলিতে?
কর্তা আজ যারা যারা　　সেদিন একত্রে তারা
রচনা করিবে শাসনতন্ত্র।

রাজাদের সে সভায় তোমাদের স্থান নয়।
তোমরাতো শুধু বাদ্যযন্ত্র।
যুদ্ধকালে প্রয়োজন বাদ্যযন্ত্র অগনন
যুদ্ধ শেষে কে করে সন্ধান?
যদি থাক সেনাপতি তবে হতে পারে গতি
সেই গুণে তুমি আজ আন।

উচ্চবর্ণহিন্দু নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলি যে পতিত মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না, গুরুচাঁদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সারা বাংলার পতিত কুলতীলকগণ সে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ১৯২৩ সালে। আজ ২০১২ সাল। ৯০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গোটা পতিত সমাজের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যায়, মতুয়াদের মধ্যে চেতনা কতটা এসেছে, তা নিয়েই প্রশ্ন করা যায়। ভোটব্যাঙ্ক হওয়া নয়, পতিতের গতি হতে যে সেনপতি বা নিজেরাই নেতা হওয়ার দরকার—মতুয়াদের এই উপলব্ধি যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল।

যে জাতির রাজা নেই। সে জাতি তাজা নেই॥
যে জাতির দল নেই। সে জাতির বল নেই॥

—এসব ছন্দ মতুয়াদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু তা কবে তাদের অন্তরের উপলব্ধিতে পৌঁছাবে সেটাই এক মস্ত প্রশ্ন!

ভারতবর্ষে ধর্ম এক গোলক ধাঁধা। তার কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। এই গোলক ধাঁধার ঘূর্ণিপাকে মানুষ খেই হারিয়ে ডুবতে ডুবতে অতলে ঠেকেছেন। মতুয়াধর্ম এই দুরবস্থায় ঘুরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে বলে—

কান্দাকান্দি নাহি চাই কাজ ছাড়া কান্দা ছাই
অকেজো কান্দুনে সব নাম।
কান্দাকান্দি ঢলাঢলি কতকাল করে এলি
কিবা ফল পেলি তাতে বল?
কর্ম ছেড়ে কান্দে যেই তার ভাগ্যে মুক্তি নেই।
হবি নাকি বৈরাগীর দল?
সে যুগ গিয়েছে চলে আমি বাপু যার ছেলে
তার ধর্মে জন্মে মহাবীর।

মতুয়াধর্ম দর্শন সহজ, সরল—তাহলো বাস্তববাদী ধর্ম। শ্রীশ্রী গুরুচাদ চরিত ধর্মের ব্যাখা দিয়েছে এভাবে —

যা ধরি বাঁচিয়া রয়  ধর্ম বলি তারে কয়
এই ব্যাখ্যা কভু নহে ভুল।

এবং ধর্মের সাথে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে—
যে যাহারে উদ্ধার করে। সেই তার ঈশ্বর॥

কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে—মানব প্রগতির পথনির্দেশ ও তার অনুশীলনই হলো মতুয়াধর্ম। এই মানব মুক্তি, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল, অবহেলিত, নিরক্ষর, অচেতন, ঘৃণিত ও গরিব মানুষ — যাদের মতুয়াধর্ম পতিত বলে নামকরণ করেছে; সেই পতিত উদ্ধারের জন্য দীর্ঘ ও কষ্টকর সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দেন, তিনিই হলেন পতিতের ভগবান।

আমরা এই প্রবন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তাতে দেখেছি পতিতদের বেঁচে থাকা ও তাদের প্রগতির জন্য বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন (১) সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার দূর করা — সত্য, চেতনা ও চরিত্র গঠনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। (২) শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হওয়া। (৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী হওয়া। (৪) ব্যাভিচার থেকে হাজার যোজন দূরে থাকা। (৫) সততা ও নিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকা (৬) প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি পতিত মানুষ শুধু নন, গোটা দেশ ও মানব সমাজের বেঁচে থাকার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই সক্রিয়তাই হলো মতুয়াধর্ম।

সেজন্য **'হাতে কাম, মুখে নাম'**—এই অমর বাণী হরিচাঁদ উচ্চারণ করেছেন। একথার গূঢ় অর্থ এই যে, হরি গুরুচাঁদের বাণী, নির্দেশ ও নীতি মেনে এবং স্মরণে রেখে সংসার ও সমাজ জুড়ে সারাজীবন কাজ করে যাওয়া। অনেকেই হাতে কাম, মুখে নাম— এর অর্থ করেন ও বোঝেন যে, কাজকর্মের মাঝেই বিড়বিড় করে হরিনাম জপ করা। মনে হয়, এ হলো ঐ বাক্যটির একেবারেই সরলীকৃত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। হরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা মেনে চলা ও জীবন গঠন করাই হল মূল কথা এবং এটাই হল হরিনামের তাৎপর্য; হরিচাঁদের নির্দেশ।

এর সাথে অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রশ্ন উঠে আসে যে, পতিত মানুষের ভগবান বা ঈশ্বর বা অবতার কে এবং কারা?—আমরা জানি যে, বর্ণাশ্রম প্রথা হলো হিন্দুধর্মের প্রাণ ভোমরা। হিন্দুধর্ম দাবি করে যে, স্বয়ং ভগবান এই বর্ণাশ্রম প্রথার স্রষ্টা। হিন্দুধর্মের শুরু থেকেই বর্ণাশ্রম আছে অথবা শাসন শোষণের স্বার্থে বর্ণাশ্রম প্রথাকেই হয়তো ধর্মের মোড়কে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে শাসন-শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্য। —সে যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি স্মরণাতীতকাল থেকে কোন ভগবান বা মহাপুরুষ ভারতবর্ষের পতিত মুক্তির ব্রত নিয়ে আর্বিভূত হননি বা এই কাজে সফলতা পাননি। এ ব্যাপারে অনেকেই শ্রীচৈতন্যের নাম করে

থাকেন। কিন্তু মতুয়া ধর্মগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, ঐ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 'কুস্রোত' বুকে নিয়ে প্রবাহিত হয়। হরিচাঁদের জন্মের পর মাত্র দু'শ বছর পূর্ণ হল। ইতিমধ্যে দেশের পতিত মানুষেরা হাজার হাজার বছরের অসম্মান, ঘৃণা, দরিদ্রতা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতির পথে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছেন। প্রগতির মহামূল্যবান অস্ত্র, সৃষ্টির মহাযজ্ঞ 'মতুয়াধর্ম' আজ তাদের করায়ত্ত। এই শানিত অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন হরি-গুরুচাঁদ। তাই, কারুর মনে কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, পতিতের একমাত্র ভগবান হরি-গুরুচাঁদ। তেত্রিশ কোটি দেবতা সৃষ্টি করা হয়েছে পতিতদের ধোঁকা দেবার জন্য। তাই, জঞ্জাল মনে করে হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থকে পরিত্যাগ করতে হবে।

হরিচাঁদের ঐতিহাসিক দ্বাদশ আজ্ঞা হলো মতুয়াধর্মের প্রাণ ও সার কথা। শুধু মতুয়ারা নন, গোটা পতিত মানুষ তথা মানব সমাজের এই বাণী সব সময় স্মরণে রাখা ও পালন করা অবশ্য কর্তব্য। দেশের আইন যতই পরিবর্তন করা হোক, ভাল আইন তৈরি হোক, লোকপাল বিল যাই হোক না কেন, মানুষ যদি ভাল না হন, মানুষ যদি সৎ না হয়ে দুর্নীতি পরায়ণ হন—কোনো আইন ঠিকমত কার্যকরী হবে না। কারণ আইন নিজে কার্যকরী হয় না, মানুষকে তা কার্যকরী করতে হয়। তাই, এমনকি দেশ গঠনের জন্যেও হরিচাঁদ ঠাকুরের এই বারোটি নির্দেশের কোনো বিকল্প নেই। এ হলো আদর্শ মানুষ তৈরি করার মহামন্ত্র—

করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বাণপ্রস্থী ব্রহ্মচারী॥
গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বানপ্রস্থী পরমহংস তাঁর তুল্য নয়॥
ঋতুরক্ষা করিবেক জীবহত্যা ভয়।
কেহবা পূর্ণ সন্ন্যাসী নিষ্কাম আশ্রয়॥
পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে।
পর দুঃখে দুখী সদা সচ্চরিত্র রবে॥
দীক্ষা নাই, করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহাশূন্য নাই সাধন ভজন॥
যত যত তীর্থ আছে অবণী পরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে॥
দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।
তীর্থে গেলে ফলপ্রাপ্তি না হইবে তার॥
দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন॥

গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল॥
কিসের রসিক ধর্ম কিসের বাউল।
ধর্ম যজি নৈষ্ঠিকেতে অটল আউল॥
কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কিবা যোগী হয়।
যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়॥
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা॥

এর সাথে হরি-গুরুচাঁদের আরও কয়েকটি বাণী মতুয়াদের সব সময় মনে রাখতে হবে। যেমন —

মতুয়ার নীতি এই শোন সর্বজন।
কুলে, বংশে, ধনে, মানে, হোক হীনজন॥
চরিত্রে পবিত্র যদি সেই ব্যক্তি হয়।
তার অন্ন খেলে দিলে দোষ নাহি তায়॥

নিঃস্বার্থ হবার উপদেশ দিয়ে হরি-গুরুচাঁদ ঘোষণা করেন—

জাতির মঙ্গল তরে কোন কাজ হলে।
ম'তোরা করিতে পারে স্বার্থ চিন্তা ফেলে॥

মতুয়াদের পরজন্ম, মৃত্যুর পরে পরপারের সুখ-দুঃখ, বেদনা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মতুয়া ধর্ম যা খুশি তাই খারাপ কাজ করে পার পেয়ে যাওয়ার তত্ত্ব প্রচার করে। ভাল ও মন্দের মধ্যকার ব্যবধান কোনদিন দূর হয় না। আমগাছ লাগালে তাতে আম ফলবে—অন্যকোন ফল যেমন হবে না; তেমনি ভাল কাজের ফল ভাল এবং মন্দ কাজের ফল খারাপ হবে। এই ফলাফল জীবদ্দশাতেই পাওয়া যায়। সেজন্যে হরি-গুরুচাঁদের নীচে উল্লিখিত অমোঘ বাণী যেন কেউ ভুলে না যান।

কর্মক্ষেত্রে সংসারেতে কর্ম মহাবল।
সকলেই পায় কর্ম অনুযায়ী ফল॥

..........................................................

কর্মকর্তা ফল ভোগ না হয়ে কি যায়।
সুকর্ম দুষ্কর্ম ফল অবশ্যই হয়॥

..........................................................

নিঃস্বার্থ ভাবেতে যেই পর উপকারী।
অকামনা শুদ্ধ প্রেম তার ব্যাখ্যা করি॥
আত্মসুখে কর্ম করে তাকে বলে কাম।
পরসুখে কর্ম করে ধরে প্রেম নাম॥

বর্তমান মতুয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্জিত অনুষ্ঠান অথবা 'দেবতা জ্ঞানে ব্রাহ্মণ ভজনা' — এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা যায়। শুধু বিতর্ক নয় — এ নিয়ে দ্বন্দ্ব, মারামারি, অনুষ্ঠান বর্জন, এমনকি সামাজিক বয়কটের মত ঘটনাও ঘটে চলেছে। সুদূর আন্দামান থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ড—বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলাদেশেও এই প্রশ্নে মতুয়াদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে ও ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ জিনিস হবার কথা নয়। কারণ এ প্রশ্নে—শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত মতুয়াদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করেছে। সে নির্দেশ থেকে মতুয়াদের শিক্ষা নিতে হবে এবং সংসার ও জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। মতুয়াদের বুঝতে হবে যে, হরিচাঁদকে পুজো দিলে তিনি যত খুশি হন, তার থেকে বেশি খুশি হন, তাঁর নীতি-নির্দেশ মেনে চললে। —তাঁর নীতি-নির্দেশ জীবনে ও সংসারে মেনে চললে, তবেই মতুয়াদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে। নতুবা কোনোদিন হরিচাঁদ খুশি হবেন না এবং মতুয়াদের আশা ও ইচ্ছা পূরণ হবে না—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি মোটে কিছু নাই।
দিবারাত্রি হরি বলে সেজেছে গোঁসাই॥
এমন আশ্চর্য কাণ্ড দেখি নাই চোখে।
হরিনামে জ্ঞান হারা হয় নাকি লোকে॥
মেতে যায় হরি বলে ভঙ্গী কর কত।
হরি বলে মেতে থাকে ও বেটারা ম'তো॥
বেদ বিধি নাহি মানে, মানে না ব্রাহ্মণ।
নিশ্চয় করিতে হবে এ দলে শাসন॥

উপরের কথাগুলি বলেছেন ওড়াকান্দির আশ-পাশ অঞ্চলের দ্বিজ বা ব্রাহ্মণরা। হরিচাঁদের নেতৃত্বে ম'তোরা ব্রাহ্মণদের মানেন না, তাদের অযথা ও অপ্রয়োজনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন না বলে তারা ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের দুঃসাহস গুড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। ব্রাহ্মণদের এই আস্ফালন বোঝা যায়। কারণ এটা অস্বাভাবিক নয়। হাজার বছরের অহংকার সহজে যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করার জন্য এইসব হরিভক্তদের একাংশ কেন অন্য হরিভক্ত অংশকে শাসন করতে চাইবেন —এটা বোঝা দুষ্কর! ব্রাহ্মণপন্থি হরিভক্ত মতুয়াদের গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি ভাবতে হবে।

ব্রাহ্মণ ভজনার বিষয়টি মতুয়াধর্ম বিরোধি। যে সব মতুয়ারা আজও ব্রাহ্মণদের ডেকে পূজা, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি করেন, আমার মনে হয় হরি-গুরুচাঁদের

শিক্ষা তারা পাননি—তা নয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে চলে আসা সংস্কার তারা ছাড়তে সাহস পাচ্ছেন না। এটা এক ধরনের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা কাটাতে মতুয়ারা হরিচাঁদের আত্মপোলব্ধির অমর বাণী স্মরণ করুন—

নামে প্রেমে মাতোয়ারা মতুয়ারা সব।
কোথায় ব্রাহ্মণ লাগে কিসের বৈষ্ণব।।

গার্হস্থ্য ধর্মের নাতিদীর্ঘ এই আলোচনার অন্তিমপর্বে অবশ্যম্ভাবীভাবে আজ ও আগামীদিনের করণীয় কাজ সম্পর্কে কিছু কথা এসে যায়। কয়েক বছর ধরে রাজনীতি প্রশ্নে মতুয়া সমাজ আলোড়িত হচ্ছে। অর্থাৎ মতুয়াদের—মতুয়া সমাজ হিসাবে রাজনীতি করা উচিত অথবা উচিত নয়? এবং যদি রাজনীতি করতেই হয়, তবে, কোন রাজনীতি, কার নেতৃত্বে এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

আমার মনে হয় এ প্রশ্নে মতুয়া সমাজ আজ ঐক্যমত হবেন যে, বর্তমানকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব সর্বব্যাপী। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিচার, এমনকি সম্মান-অসম্মান প্রাপ্তি বিষয়ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রনাধীন। সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করে আজ আর এক পাও অগ্রসর হবার পথ খোলা নেই।

স্বয়ং গুরুচাঁদ তার জীবদ্দশায় এই পরিণতির আভাস পেয়েছিলেন এবং তার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিজে হাতে কলমে কিছু কাজ শুরুও করেছিলেন—তার প্রমাণ আমার এ লেখায় উল্লেখ করেছি।

রাজনীতি করা উচিত, কি উচিত নয়? — শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত বিশ্লেষণ করলে নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় যে, মতুয়াদের মধ্যে এই প্রশ্ন ওঠা ঠিক নয়। গুরুচাঁদের নেতৃত্বে 'খুলনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত', 'অসহযোগ আন্দোলন ও অনুন্নত সমাজ' অধ্যায়—এসব পাঠ করলে বোঝা যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মতুয়াদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। তাছাড়া পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, আচার্য মহানন্দ হালদার প্রমুখ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এম. এল. এ., এম. পি. নির্বাচিত হয়েছেন। এ দু'জন মহামানব শুধু ব্যক্তি নন। তারা এবং মতুয়া সমাজের প্রায় সমার্থক। তারা মতুয়া সমাজের আদর্শ ব্যক্তিত্ব। আমরা দেখেছি—অতি সাম্প্রতিককালে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় মতুয়াদের তরফে বাগদা কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনী লড়াই পরিচালিত হয়েছে এবং বড়মা বীণাপাণি দেবী ঠাকুরানী স্বয়ং নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন। — নির্বাচনী সাফল্য কতটা হয়েছে, কি হয়নি — তাকে মুখ্য করা ঠিক নয়। কাজটা নতুনভাবে শুরু হয়েছে, এটাই বড় কথা।

শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতের ভূমিকায় বড়মা বীণাপাণি দেবী ঠাকুরানী লিখেছেন — "(গুরুচাঁদ) রাজনীতির ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছিলেন এবং নিজের পৌত্র শ্রীশ্রী প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।" শ্রীশ্রী লীলামৃত গ্রন্থের ভূমিকায়

প্রমথরঞ্জন ঠাকুর লিখেছেন — "রাজনীতির সহিত ধর্মের কোন সংস্রব নাই — অনেকে ঐ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। রাজনীতির অর্থ শ্রেষ্ঠ নীতি। উহা দ্বারা কেবল রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না, উহা দ্বারা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সর্ব সাধারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের সর্ববিধ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক গৃহীর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।"

এ জন্য বলা যায় যে প্রশ্নটা রাজনীতি করা, না করার নয়—প্রশ্ন হলো কার নেতৃত্বে, কোন রাজনীতি করা প্রয়োজন? মতুয়াধর্মের নির্দেশ হলো ন্যায় ও সত্যের পথে পতিত মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি করতে হবে। যেখানে—

**'যদি থাক সেনাপতি, তবে হতে পারে গতি'** (গুরুচাঁদ চরিত)। গুরুচাঁদের এই নির্দেশের অর্থ হল—পতিতদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল গঠন ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা। সেটাই পতিত রাজনীতির সাফল্য এনে দেবে। নেতৃত্বে আনতে হবে সমাজের সেরা ও যোগ্য মানুষকে। দেশের গোটা পতিত সমাজ, মেহনতী ও গরিব মানুষকে সমাবেশিত করে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে উচ্চ বর্ণহিন্দুদের নেতৃত্বে রাজনীতি করতে গিয়ে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে—তা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে এবং ঐ ভুল দ্বিতীয়বার যেন পতিত মানুষেরা না করেন। বর্তমানে মতুয়া সমাজ পূর্বের তুলনায় সংঘবদ্ধ। তাই, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের পুরনো খেলায় আবার মেতে উঠেছে। মতুয়া আন্দোলনকে বিভক্ত ও বিপথগামী করার জন্যই তারা মন্ত্রিত্বের টোপ দিয়েছে। তারা একজনকে দিয়ে মতুয়াদের এবং অন্য আরেকজনকে দিয়ে আম্বেদকরবাদীদের ব্রাহ্মণ্যবাদী খাঁচায় বন্দি করতে চান। এ ব্যাপারে গোটা পতিত সমাজকে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে এবং পাল্টা কৌশলে লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে হবে।

মতুয়াধর্ম যেমন কাউকে স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী হতে শিক্ষা দেয় না; তেমনি অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করতেও শিক্ষা দেয় না। মানুষকে যুক্তিবাদী হতে শেখায়। পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা ও গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয়; কারণ এই পথই পতিতদের সাফল্য এনে দেবে। তাই, আমরা দেখি—গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এমনকি গুরুচাঁদ ঠাকুরের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর নেতাও স্বজাতিগণকে একত্রিত করে পরামর্শ করেছেন, সবার মতামত শুনেছেন এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমি বলিয়াছি তবে সাহেবের কাছে।
স্বজাতির কাছে শুনি জমি দিব পাছে॥
একারণ সকলেরে আহ্বান করেছি।
জাতিকে উঠাব বলে সাহেবে ধরেছি॥
কিবা মত, কিবা মন, বল অকপটে।
ভালমন্দ সবে মিলি কর এক জোটে॥

গুরুচাঁদ ঠাকুর সভার উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করে সভায় বলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রী ডাক্তার মীড সাহেবকে তিনি গ্রামে জায়গা দিতে চান। গুরুচাঁদের মতে তাতে পতিতদের সুবিধা হবে। রাজশক্তির সুনজর থাকবে, সহযোগিতা মিলবে এবং বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার্থে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলবে। কিন্তু স্বজাতি সভায় মতান্তর হল। কিছু মানুষ আশংকা প্রকাশ করে জানালেন যে, পাদ্রীর ইচ্ছা হল কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে মানুষকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। তারা পার্থিব সুযোগ সুবিধা থেকে হিন্দুধর্মকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলেন। বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বিধু চৌধুরী যখন নানা যুক্তির মাধ্যমে ডাক্তার মীডের আগমনের বিরুদ্ধে বলেন, তখন বহুজন তাকে সমর্থন করেন। বিধু চৌধুরী ছিলেন প্রভাবশালী মোড়ল এবং বিজ্ঞ মানুষ। তিনি মনের নানা সংশয়ের কথা নিবেদন করেন—

কর জোড় করি বিধু দাঁড়াইয়া কয়।
শুন প্রভু এ ব্যাপারে যাহা মনে হয়॥
তব আজ্ঞা শিরোধার্য অবশ্য করিব।
মানিবার পূর্বে তাহা বঝিয়া মানিব॥

বিধু চৌধুরী অসার কথা বলেননি। তার কথায় কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল। গুরুচাঁদ সব কথার জবাব দেন। সব আশংকা দূর করেন। ধর্ম কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, তা যে এক মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা, তার ব্যাখ্যা দেন। মীডের সহযোগিতা কেন প্রয়োজন তা বিশদে বলেন। এবং এভাবে আলাপ আলোচনা ও গণতান্ত্রিক পথেই যে আগামীদিনে সমাজকে চালাতে হবে, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তার শিক্ষা দেন। পরিশেষে বিধু চৌধুরী গুরুচাঁদের প্রতি আস্থা জানিয়ে বলেন—

কাণ্ডারী যদ্যপী বলে কোন ভয় নাই।
ত্রিজগতে মোরা আর কাহাকে ডরাই?

অন্ধ আনুগত্য নয়, চরিত্র, প্রেম, সততা, নিষ্ঠা, যুক্তি ও বিচারবোধ হল মতুয়া ধর্মের চালিকা শক্তি। হরি-চাঁদের শিক্ষা ও নীতি পাথেয় করে মতুয়া ধর্ম উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পুব আকাশ আলোকিত করে ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। একদিন গোটা পৃথিবীর মানব সমাজ এই আলোয় আলোকিত হবেন। ❐